শ্রেষ্ঠ গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SHRESTHA GALPA
A Collection of Bengali short stories
by SIRSHENDU MUKHOPADHYAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (003) 2219-2041
e-mail : dyspublishing@hotmail.com
Rs. 130.00

ISBN 978-81-295-1811-8

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, মাঘ ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
নবম সংস্করণ : মার্চ ২০১৩, ফাল্গুন ১৪১৯

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

১৩০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপন : বীণাপাণি প্রেস
১২/১এ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

"রা-স্বা"

শ্রী সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

পদক্ষেপ

কাছের ঠাকুর

হরিপুরের হরেক কাণ্ড

আক্রান্ত

বাঙালের আমেরিকা দর্শন

একাদশীর ভূত

ওয়ারিশ

গল্প সমগ্র ১ম/২য়/৩য়

চারদিক

ফেরীঘাট

বড় সাহেব

অদ্ভুতুড়ে

জোড় বিজোড়

মাধুর জন্য

গোলমাল

সূচিপত্র

ট্যাংকি সাফ	৯
ওষুধ	২১
খগেনবাবু	২৯
দেখা হবে	৩৮
সম্পূর্ণতা	৪০
বৃষ্টিতে নিশিকান্ত	৪৯
উত্তরের ব্যালকনি	৫৯
স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু	৭৩
আমাকে দেখুন	৮১
তোমার উদ্দেশে	৯০
পটুয়া নিবারণ	১০২
মুনিয়ার চারদিক	১১১
নীলুর দুঃখ	১২১
দূরত্ব	১৩১
গঞ্জের মানুষ	১৪১
ঘণ্টাধ্বনি	১৫৫
ইচ্ছে	১৭১
হরীতকী	১৮২
ঘরের পথ	১৮৯

ট্যাংকি সাফ

ট্যাংকি সাফ করতে ষাট চেয়েছিল মাগন। চল্লিশ টাকায় রফা হয়েছে।

তো মাগন সেপটিক ট্যাংকির লোহার চাক্কি কোদাল মেরে খুলে বুরবকের মতো চেয়ে রইল। আই বাপ! হাউস ফুল!

হাউস ফুল না হলে ট্যাংকি সাফ করায় কোন আহাম্মক? কিন্তু মুশকিল হল, মাগনের আজ কোনো পার্টনার নেই। কাল হোলি গেছে, আজ রবিবার, মরদরা আজও সব ঢলাঢল জমি ধরে নিয়ে পড়ে আছে। এ বাত ঠিক যে মুর্দার কানে কানে টাকার কথা বললে মুর্দাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু মাতালরা তো মুর্দা নয়। আর তাদের উঠিয়েও কোনো লাভ নেই। টাকার লোভে কেউ হয়তো গার্দা সাফ করতে এসে ট্যাংকির মধ্যে পড়ে গজব হয়ে যাবে।

প্রথম ট্যাংকিতে ময়লা, দু-নম্বরে জল, তিন নম্বরেও জল। তিন নম্বরে পয়লা বালতি মেরে গান্ধা জল তুলে ড্রেনে ঝপাং করে ফেলে মাগন আপনমনে বলে—আই বাপ! হাউস ফুল! চালিশ টাকার তো স্রিফ পাসীনা চলে যাবে। ফিন ভিটামিন উটামিন দিবে কৌন?

বারান্দা থেকে দত্তবাবু দেখছেন, হেঁকে বললেন—কী বলছিস রে ব্যাটা?

মাগন ঝপাং করে দুসরা বালতি মেরে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলে—একটা বাংলা সাবুনের দাম দিবেন তো বড়বাবু? আর চায় পীনেকো পয়সা। আউর হোলির বখশিশ।

—ব্যাটা নাত-জামাই এলেন।

—এমন সাফ করে দিব না বড়বাবু। একদম বেডরুম।

—বকবক করিস না, হাত চালা। বেলা ভর তোর কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

তিন নম্বর বালতি মেরে মাগন বলে—গিয়ে আরাম করুন না, কুছ দেখতে হবে না। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

দত্তবাবু স্টেটসম্যানটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন প্লাস পাওয়ারের চশমাটা চোখে নেই। চেঁচিয়ে বললেন,—মুনমুন, আমার পড়ার চশমাটা দিয়ে যা তো।

বলে কাগজের বড় হেডিংগুলো দেখতে লাগলেন। মন দিতে পারলেন না। চল্লিশ টাকার কাজ হচ্ছে সামনে। দু-ঘণ্টা বড় জোর তিনঘণ্টা কাজ করে ব্যাটা চল্লিশ চাক্কি ঝাঁক দিয়ে নিয়ে যাবে। রোজ একটা করে সেপটিক ট্যাংক যদি সাফ করে তবে মাসে কত রোজগার হয়?

ভাবতে গিয়ে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। বারোশো টাকা!

দত্তবাবু খুব জোর হেঁকে বললেন—জোরসে চালা! জোরসে!

ট্যাংকির ভিতরে বক বক করছে জল। গহীন গান্ধা জল। ঝপাঝপ বালতি মারে

মাগন আর বলে—চালাচ্ছে বাবা। বহুৎ গান্ধা বাবা, বহুৎ কাদো। চালিশ রুপিয়া স্রিফ পসীনা মে গিয়া বাবা। ভিটামিন দিবে কৌন?

২

মুনমুন সাজছে। সময় নেই।

ক'দিন আগেও চুলের গুছির গোড়ায় একটা গারডার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে পারত। আজকাল আর তার জো নেই। যাদবপুরের জল এত খারাপ যে গত দু'বছরেই চুল উঠে উঠে এই কটা হয়ে গেছে। এখন মাথায় হাত বোলালেও চুল উঠে আসে। একবার চিরুনি চালিয়ে আনলে উঠে আসা চুলের গোছা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়। এখন বব করেছে। তবু চুলের পিছনে খাটতে কম হয় না। শুধু চুল? গায়ের রং মেটে হয়ে গেল। যে দেখে সেই বলে—ইস। কী কালো হয়ে গেছিস! কতবার বলেছে বাবাকে, এবার যাদবপুর ছাড়ো। আর নয়, এর পর মাথায় টাক পড়বে, গায়ের রং হয়ে যাবে টেলিফোনের মতো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে ভুল করে বলে উঠবে, হ্যালো!

সময় নেই। শুধু শাড়িটা পরা বাকি।

—ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে দিবি লক্ষ্মীটি? বলতে বলতে গিয়ে সে হুস করে চুনুর সামনে পিছু হয়ে উঠে হয়ে বসে পড়ে।

চুনুর মুখ দেখে তার মন বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে সে এইটে অভ্যেস করেছে। মুখে একটা ভালমানুষি, আর বড় বড় চোখে ভাসানো দৃষ্টিতে সে চায় সব সময়ে। দিদিকে আসতে দেখেই চুনু একটা কাগজ লুকিয়ে ফেলল ফ্রকের ঘেরের নিচে।

—একক সংগীত তোর ভাল লাগে? বাব্বাঃ, আড়াই ঘণ্টা ধরে একক গলার গান শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায় না?—ইস, হুকগুলো সব চেপটে গেছে। লন্ড্রীতে দিয়েছিলি বুঝি ব্লাউজটা? আছড়ে কেচেছে, হুকের মাথাগুলো সব বসে গেছে।

মুনমুন অধৈর্য হয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কর না।

—করছি তো! হুকগুলো ঘরে ঢুকছে না যে! একটা সেফটিপিন দে, খুঁটে তুলি।

মুনমুনের নতুন প্রেমিক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদনে। মুনমুন খুব ভাল জানে এও বেশিদিন টিকবে না। শেষ পর্যন্ত কে যে পাবে তাকে তা কি এখনই বলা যায়। সতেরো বছর বয়সে কী করে বলবে, আসল লোকটা কে। এখনো কত জন আছে, কত রোমাঞ্চ আছে, কত রহস্য ও ঘটনা! তবু এখনকার মতো এই প্রেমিকটিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সব সময়েই একটু দেরি করে যাওয়া ভাল। তা বলে বেশি দেরিও নয়। তাতে উৎকণ্ঠার বদলে বিরক্তি এসে যায়। মুনমুনের একটা হিসেব আছে। সে হিসেব মতো একটু বেশিই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ঝটকায় সরে এসে বলে—ছাড় তো! তোর কম্ম নয়।

বলে সে নিজে নিজে ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছু ফিরে হাত পিছনে ঘুরিয়ে টপাটপ হুক লাগিয়ে ফেলে, বলে—কোথায় হুক চেপটে গেছে! আমার হাতে লাগল কী করে? মারবো থাপ্পড়—

চুনু ভাসা চোখে চেয়ে থাকে ভালমানুষের মতো। যেন জানে না, হুক ঠিক ছিল।

বলল—সুচিত্রার গান রোজ তো শুনছিস বাবা, রেডিওয়, গ্রামোফোনে, মাইকে। আর কত? ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

—সুচিত্রা কখনো ডাল-ভাত হয়ে যায় না। আর হলেই কী? তুই রোজ ভাত খাস না? খারাপ লাগে? ভাত না পেলে তো কুরুক্ষেত্র করিস!

হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়ে চুনু ফ্রক তুলে নাক চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে—এঃ মা! কী গন্ধ আসছে।

প্রচণ্ড সেন্ট মেখেছে মুনমুন। প্রথমে সে পায়নি, এখন পেল গন্ধটা। একটা 'ওয়াক' তুলে দৌড়ে গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে এসে 'উঁঃ উঁঃ' করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—সেপটিক ট্যাংক খুলেছে। শিগগির জানলা বন্ধ কর।

৩

একটা দড়ি, দিবেন বড়বাবু? আব পানী নীচা হয়ে গেল, বালতিতে দড়ি লাগাতে হবে।

—ওঃ দড়ির কথা আগে বলবি তো! দাঁড়া দেখি আছে কি না।

মাগন একগাল হেসে বলে—বারো আনা পয়সা দিন তো লিয়ে আসি।

—পয়সা দিলে পাওয়া যায় সে জানি! চালাকি করিস না। দেখছি দাঁড়া।

দত্তবাবু চেঁচালেন—কোথায় গেলে গো? এ ব্যাটা দড়ি চাইছে। আছে নাকি?

লীলাময়ী রান্নাঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দত্তবাবু দেখেন, ফাঁকা রান্নাঘরে উনুনের ওপর ডাল ফুটছে। ডালের ফেনা উথলে উনুনের গায়ে পড়ে ছাঁক-ক্ ছ্যাঁক-ক্ শব্দ উঠছে।

দত্তবাবু ফিরে দাঁড়াতেই অন্যায়ের দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

দত্তবাবু তাঁর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' বলে ডাকেন না বলে লীলাময়ীর বড় অভিমান। কিন্তু এ লোককে 'বাবা' বলে ডাকা যায়? দত্তবাবু দেখতে পেলেন, ভিতরে দু'ঘরের মাঝখানকার প্যাসেজে তাঁর রোগা খুনখুনে বুড়ো শ্বশুরমশাই খুব গোপনে একটা গামছায় নাক ঝাড়ছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের ভয়ে দত্তবাবু তাঁর পরিষ্কার গামছাখানা সব সময়ে লুকিয়ে রাখেন। কারণ শ্বশুরমশাইয়ের নিজের দুখানা গামছা থাকা সত্ত্বেও সে গামছায় তিনি নাক ঝাড়েন না বা পায়ের তলা মোছেন না। ও দুটো কাজের জন্য তিনি সব সময়েই অন্যের গামছা চুরি করেন। এখনো করছেন। আরো আছে। নিজের হাওয়াই চপ্পল থাকা সত্ত্বেও পায়খানা যাওয়ার সময় শ্বশুরমশাই লুকিয়ে জামাইয়ের হাওয়াই দুটো পায়ে দিয়ে যান।

কার না রাগ হয়? কিন্তু মুখোমুখি চোটপাট করে কিছু বলাও যায় না। কুটুম মানুষ।

দত্তবাবু প্যাসেজটার মধ্যে এগিয়ে বললেন—গামছাটা আপনি পেলেন কোথায়?

'বাবা' ডাকেন না বলে শ্বশুরমশাই দত্তবাবুকে কম খাতির করেন তা নয়। বরং বেশিই করেন। বাবা ডাকেন না বলেই খাতির করেন। খাতিরের চেয়েও বেশি। ভয় পান।

বুড়ো মানুষ ভয়ে হাঁ করে আছেন। আড়ষ্ট হাতে জামাইয়ের গামছা সামলে নিয়ে বললেন—এইখানেই ছিল। সরিয়ে রাখছি। দেখো, তোমার গামছায় যেন কেউ হাত না

দেয়। কাউকে হাত দিতে দেবে না। আমিও সবাইকে বারণ করি, অধীপের গামছায় তোমরা কেউ...

দত্তবাবু মুখটা কুঁচকে সরে এলেন। গামছাটা আজ আর একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সরে আসতে আসতেই শুনতে পেলেন, 'হ্যাক' করে থুতু ফেলার শব্দ। পিছনে আর তাকালেন না। তাকালে আর সারাদিন জল খাওয়া হবে না। প্যাসেজেই জলের কুঁজো রাখা। শ্বশুরমশাই সারাদিন বাড়ির সর্বত্র থুতু ফেলছেন। সর্বত্র।

লীলাময়ী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরের ঘরের দরজার পাশে। একটু গোপনীয়তার ভঙ্গি মাখানো তাঁর শরীরে।

গোপনীয়তাটা বাহুল্যমাত্র। বাইরের ঘর থেকে যে আসছে তা শোনবার জন্য কান পাততে হয় না।

৪

যতটা সুভদ্রাকে ততটা আর কোনো মেয়েমানুষকে ঘেন্না করে না অধীপ। গুয়ের পোকাও কি ওর চেয়ে ভাল নয়?

সুভদ্রা খাটে বসে আছে, সামনের দিকে জোড়া পা ছড়ানো, পিছনে হাতে ভর। মুখ সাদা, চোখ জ্বলছে। বলল—ন্যাকা—জানো না?

—তুমি বলতে পারলে? কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে বলতে পারে ওকথা?

—নিজেরা কী? লোকে শুনলে থুতু দিয়ে যাবে গায়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে! আমি ভদ্রলোকের মেয়ে না তো কী?, তোমার মতো ইতরের বাচ্চা?

মেয়েমানুষকে মারা ভাল নয় অধীপ জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, মার—মারের মতো এমন নিরাময় আর কিছুতেই নেই। মারাই বোধ হয় সবচেয়ে শান্তি। এক পা এগিয়ে সে শরীরে রিম-ঝিম রাগের নাচ শেষ কয়েক মুহূর্তের জন্য সহ্য করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল—এই বজ্জাত মাগী! মুখ ঘষে দেবো দেয়ালে!

দাও না! দাও! বলে চোখের পলকে উঠে আসে সুভদ্রা। একদম কাছে এসে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—ছোটোলোকের ইতরের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে আর কী আশা করব? মারো!

অধীপ কথা বলতে পারে না। কাঁপে। স্ট্রোক হয়ে যাবে! ডিভোর্স...

সুভদ্রা ধকধক করতে করতে বলে—ন্যাকা। জানো না, তোমার শরীরে কীসের রক্ত! গুষ্টিসুদ্ধ বদমাইশ তোমরা, জানো না? তোমার ঐ আদরের লেংড়ী বোন চুনু কেন আমাকে বিয়ের পরদিনই বলেছিল—এই বৌদি, তুমি কেন আমার দাদার সঙ্গে শোবে!

অধীপের এ কথাটা মাথায় ঢোকে কিন্তু সুভদ্রাই কথাটা বলতে—এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তার সমস্ত বিশ্বাসের তুমি থেকে কে যেন তাকে তুলে ছুড়ে দেয় অন্য একটা হীন আর ক্লীব জগতে। সে কাঁপতে কাঁপতে কসাইয়ের গলায় বলে—কেন বলেছিল?

সুভদ্রা সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে দিগবসনা আক্রোশে প্রায় নেচে উঠে বলে—সহ্য হবে কেন? আদরের দাদার সঙ্গে অন্য কেউ শোয় তাতে বুক জ্বলে যাবে না? ছিঃ ছিঃ। তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাও কী করে?

অধীপ হঠাৎ পাথরের মতো শান্ত হয়ে গেল! খুন করার আগে যেমন মানুষ কখনো কখনো হয়। একটু বাদেই সুভদ্রা তার হাতে খুন হবে, সুতরাং সে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পর ঠান্ডা গলাতেই বলল—তুমি নর্দমার পোকা।

—তা তো বলবেই। নিজেরাই কিনা! শ্বশুর আমাকে ভালবাসে বলে তোমার মা বলেনি, শ্বশুর বলেই কী, পুরুষ তো। যুবতি বউয়ের সঙ্গে অত মাখামাখি কীসের? তুমিও বলোনি, সুভ, তুমি বাবার সঙ্গে অত মেলামেশা কোর না। বলোনি?

বলেছে। ঠিক কথা, মায়ের কাছে শুনে তারও এক সময়ে বিশ্বাস হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সুভদ্রার অত স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। বলেছে। কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না।

সুভদ্রা ঝোড়ো দ্রুতবেগে বলে—সন্দেহ করোনি নিজের বাবাকে? অমন মাতৃভক্তির কপালে ঝাঁটা। ডাইনি মুখে পোকা পড়ে মরবে, পচে-গলে মরবে।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গন্ধটা আসে। বহু দিনকার জমানো মল, ময়লা, জলের প্রচণ্ড গ্যাস। ঘরটার বাতাস পলকে বিষিয়ে ওঠে, কিন্তু তারা দুজন গন্ধটাকে টেরই পায় না; কিংবা পেয়েও উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা হয়তো তারা ঠিক এই মুহূর্তে দুর্গন্ধটাকে উপভোগই করে।

আশ্চর্যের বিষয়, অধীপ হাসল। অবশ্য এটা হাসি নয়। খুন করার আগে অভ্যস্ত খুনী কখনো-সখনো এরকমই হাসে হয়তো।

তারপরেই সে চড়টা মারল। সুভদ্রা যে পাঁচ মাসের পোয়াতি তা মনে রইল না। লক্ষ্যও করল না যে তার দু-বছরের ছেলে দৃশ্যটা দেখছে।

৫

—চালা! জোরসে চালা জলদি।

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। পাম্প তো নেহি যে ভটভট করে গার্দা খিঁচে লিবে!

দুনম্বর ট্যাংকিতে খপ করে বালতি মারে মাগন। হাউস ফুল।

দত্তবাবু চেঁচিয়ে বলেন—এই ব্যাটা ময়লা ফেলার গর্ত করবি না?

—হাঁ, হাঁ, গোর্তো হোবে, গোর্তো ভী হোবে। এক বোতল সরাবের দাম দিবেন তো বড়বাবু?

—নালীতে ময়লা ফেলবি তো পয়সা কাটবো। নালী আটকালে বাড়িওলা পাঁচকথা শোনাবে। খুব সাবধান।

—কোই চিন্তা নাই বড়বাবু। কাম পুরো করে পয়সা লিব।

প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পরেও স্টেটসম্যানের খবরগুলো দেখতে পান না দত্তবাবু। পুরোটাই আবছা, অস্পষ্ট, হিজিবিজি এবং অর্থহীন। তবু মুখের সামনে কাগজটা ধরে রাখেন। মুখোশের মতো।

মুনমুনকে চিঠি দিয়েছিল বাড়িওলার ছেলে মিলন। সেই চিঠি বাড়িওলা রসিকবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দত্তবাবু। সেই থেকে গণ্ডগোলের শুরু। রসিকবাবুর স্ত্রী ওপরতলা থেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দিলেন—এ হতেই পারে না। নষ্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়ে মিলুও গোল্লায় যাচ্ছে। তুলে দাও।

দত্তবাবুর কিছু বলার দরকার হয়নি, লীলাময়ী নীচতলা থেকে গুষ্টি উদ্ধার করলেন ওঁদের। কয়েকদিন দত্তবাবু বুকের প্যালপিটিশনে কষ্ট পেলেন খুব। তাঁর খুব ইচ্ছে করে, যে বাড়িওয়ালার যুবক ছেলে নেই তার বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু ইচ্ছে তো আর পক্ষিরাজ নয়।

এক বছর আগেকার সেই ঘটনা থেকেই অশান্তি চলছে। রান্না করতে করতে মাঝখানে কলের জল বন্ধ হয়ে যায়। আঁচাতে গিয়ে বেসিনে জল পাওয়া যায় না। লীলাময়ী নীচে থেকে দাপিয়ে চেঁচান। আর দত্তবাবুর ঝি বাসন মেজে কলতলায় ছাই ফেলে এলে ওপর থেকেও দাপানো আর চেঁচানোর শব্দ হয়।

শ্বশুরমশাই বকের মতো পা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছেন জল ঘাঁটতে। এ বাড়ির জলকষ্টের মূলে এই লোকটার অবদান বড় কম নয়। সারাদিন জল ঘাঁটছে লোকটা। হাঁপানি আছে। সর্দির ধাত আছে। সারা রাতের কাশি আছে। আর সেই সঙ্গে জল ঘাঁটাও আছে। জল ঘাঁটুক, তাতে দত্তবাবুর আপত্তি নেই। তিনি শুধু শ্বশুরমশাইয়ের পায়ের চপ্পলটা লক্ষ্য করলেন। দত্তবাবুর চপ্পলের স্ট্র্যাপ নীল রঙের, শ্বশুরেরটা খয়েরি।

খয়েরি দেখে দত্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার স্টেটসম্যাসের মুখোশ পরলেন, পরার দরকার ছিল। কারণ লীলাময়ী আসছেন।

এসে একটা মুখ-ছেঁড়া খাম দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এই সেই চিঠি!

—কীসের চিঠি?

—বউমার বাক্স থেকে বোধহয় চুনু নিয়েছিল।

—কেন?

—অন্যায় করেছে নিয়েছে। হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। এই নিয়েই অধীপের সঙ্গে ঐ ঝগড়া।

দত্তবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বলেন—কবেকার চিঠি?

—বিয়ের আগে অধীপ বউমাকে যে-সব চিঠি লিখত তারই একটা। কী দরকার ছিল পুরোনো চিঠি জমিয়ে বুকে করে রাখবার? পুড়িয়ে ফেলা যেত না। ঘরে বয়সের ননদরা রয়েছে, কোলের ছেলেও বড় হচ্ছে....

—তুমি চিঠিটা পড়েছ?

খুব দৃঢ় গলায় নয়। ঝংকার দিয়ে লীলাময়ী বললেন—পড়ব কেন?

—পড়োনি?

—ওপর ওপর দেখেছি একটু। কী এমন কথা যার জন্য মাগীর আঁতে ঘা পড়ল...ওঃ, এই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে আছ কী করে? তুমি মানুষ না কী?

—কেন? ভাল না করারই কী? তুমিও দেখ না। বলে লীলাময়ী খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বলে—পড়েই দেখ।

—বউমা কী করছে?

—কাঁদছে, ঘরে দরজা দিয়ে।

—তুমি যাও।

লীলাময়ী চলে গেলে দত্তবাবু চিঠিটা খোলেন।...অশ্লীল, খুবই অশ্লীল চিঠিটা।

মন থেকে আজ কেমন জোর পাচ্ছেন না। মনের জোরের জন্য খানিকটা নৈতিকতা দরকার। হাঁ, মর‍্যালিটি। তা কি তাঁর আছে?

লীলাময়ী দুর্গন্ধের কথা বলে গেলেন। কিন্তু তিনি দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন না।

৬

ডাক্তারকে খবর দেওয়া ছিল। সদর থেকে তাঁর হাঁক শোনা গেল এইমাত্র—কই বউমা কোথায়!

বাইরের বারান্দাটাই এখন বসার ঘর। অধীপের বিয়ের পরই বাইরের ঘরটার দরকার হল। তখন বারান্দাটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে সোফা সেট পাততে হল।

লীলাময়ী প্রমাদ গুনলেন। বউমাকে দেখতে এসেছে। সর্বনাশ! তার বাঁ গালে অধীপের পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে এখনো, তার ওপর নাগাড়ে কাঁদছে। বাইরের লোকের সামনে বেরোবে না কিছুতেই। যদিও বা বেরোয় তো ডাক্তার সবই লক্ষ্য করবে।

উঠে গিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে বললেন—বসুন।

—বেশি বসবার উপায় নেই। চেম্বারে রুগী বসে আছে।

লীলাময়ী নিঃশব্দে গিয়ে দরজার সামান্য শব্দ করে চাপা গলায় ডাকেন—বউমা! বউমা! ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দাও। ঠিকঠাক হয়ে নাও।

সুভদ্রা পাঁচ মাসের পোয়াতি। বড় ছেলে দুই পেরিয়েছে। সে হতে বড় কষ্ট গিয়েছিল। অধীপ তাই ঘনঘন ডাক্তার ডেকে চেক-আপ করায়। কিন্তু আধীপটা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থাটা সামাল দেবেন কীভাবে তা ভাবতে ভাবতে লীলাময়ী গিয়ে চায়ের জল চাপান। চৌধুরি পারিবারিক ডাক্তার, তাঁর কাছে তেমন লজ্জা নেই। তবু তো লজ্জা! আজকালকার বউয়েরাও ভারি নির্লজ্জ। কথায় কথায় পরপুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের খুলে দেয়। ডাক্তাররা গোপন জায়গায় হাত দেয়, টিপ দিয়ে দেখে, অসভ্য সব প্রশ্ন করে। মাগো! লীলাময়ী মরে গেলেও পারবেন না। তাঁকে কয়েকবার লেডি ডাক্তাররা দেখেছিল। তাতেই কী লজ্জা!

শচীলাল ডাক্তারের গন্ধ পেয়েছেন। থুতু ফেলার জন্য তাঁর একটা টিনের কৌটো আছে। সেইটে গিয়ে গোপনে বেসিনে ধুচ্ছিলেন। জল ঘাঁটছেন টের পেলে মেয়ে আজকাল বড় বকে।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কৌটো রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসেই বললেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গত দু-বছর যাবৎ আমার পেটের কোনো গোলমাল নেই।

চৌধুরি হেসে বলেন—বাঃ খুব ভাল।

—যা খাই সব হজম হয়। ইঁটের মতো শক্ত পায়খানা। আপনি আমাকে রোজ সকালে দুটো করে মুরগির ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যান।

—সে আমি বুঝব 'খন। শ্বাসের কষ্টটা কেমন আছে?

—এটাই যা একটু কষ্ট দেয়, আর সব ভাল।

লীলাময়ী চা নিয়ে এসে বাবাকে দেখে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেন—তোমার আবার কী?

শচীলাল একগাল হেসে চৌধুরিকে বলেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু লীলা ভাবে আমি পেট খারাপের কথা লুকোই। কাল তাই প্যানের ওপর পায়খানা করে ডেকে দেখালাম। বল না লীলা ডাক্তারবাবুকে কেমন পায়খানা!

চৌধুরি বলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

লীলাময়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, চাপা গলায় শচীলালকে বলেন—এখন ঘরে যাও তো!

—চা করলি?

—তুমি এখন খাবে না চা। স্নান করো গে। একেবারে ভাত দেবো।

—চালকুমড়ো পাতার পুর করবি না?

লীলাময়ীর হাত-পা নিশপিশ করে। গোপনে আবার এসে, বউমার ঘরের দরজা নাড়া দেন—শুনছো বউমা?

ঘরে ছেলেটা কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখেই শুরু করেছিল। তারপর থেকেই ভ্যাবাচ্ছেই।

সুভদ্রার কান্না থেমেছে। গম্ভীর গলায় বলল—ডাক্তার বিদেয় করে দিন গে। আমি দেখাবো না। আর বিরক্ত করবেন না আমাকে।

ভারি অসহায় বোধ করেন লীলাময়ী। কী করবেন? চৌধুরি এসেছেই যখন রুগী দেখুন আর না দেখুক ভিজিটের টাকাটা দিতেই হয়। কিন্তু অধীপ ভিজিটের টাকা রেখে যায়নি।

৭

—ইসি ট্যাংকিমে আর কুছু নাই বড়বাবু।

—নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? ডান্ডা মার, মার ডান্ডা। দেখি কতখানি আছে।

মাগন বলে—হাঁ হাঁ দেখে লিন।

ডান্ডা মারতেই সেটা ভচাক করে দু-হাত পুরু ময়লায় ডেবে গেল।

—ঐ তো। এখনো অর্ধেক রয়ে গেছে। চালাকি করার আর জায়গা পাস না? চল্লিশ টাকা কি এমনি এমনি দেবো?

ডান্ডা তুলে ময়লার দাগ দেখিয়ে মাগন বলে—বাস এইটুকু তো সব ট্যাংকিতে থাকে। ট্যাংকি কি কখনো পুরা সাফা হয় বড়বাবু? কুছু তো থেকেই যায়। ই তো স্রিফ বালু আছে।

—বকবক না করে কাজ কর তো।

—হাঁ হাঁ কাম তো করছে বড়বাবু।

দু-নম্বর ট্যাংকিতে জলের নিচে ময়লা এখনো থকথক করছে। শক্ত মাল। বালতি মারলে ডোবে না। পা গর্তে ঢুকিয়ে চেপে বালতি ডোবায় মাগন। বলে—বহোত পরেসান বাবা। একটা পুরানো জামা দিবেন তো বড়বাবু? ট্যাংকি বেডরুম বানিয়ে দিব।

কিন্তু লীলাময়ী এলেনই। নাকে চাপা আঁচলের ফাঁক দিয়ে বললেন—চৌধুরি এসেছে। বউমা ডাক্তার দেখাবে না বলছে। কিন্তু ভিজিটটা তো দিতে হয়। অধীপ টাকা রেখে যায়নি।

বিরক্ত দত্তবাবু বলেন—আমার ব্যাগ থেকে নিয়ে দিয়ে দাও গে। অধীপ এলে চেয়ে রেখো।

—চাইবো, কিন্তু সে দেবে কেন? তার বউকে তো আর দেখেনি।

—সেই তো ডেকেছে, আমরা তো কল দিইনি। রেসপনসিবিলিটি তার।

লীলাময়ী নাকটা ছেড়ে একটু দম নিতে গিয়েই দুর্গন্ধে শিউরে উঠে 'হ্যাক' শব্দ করে আবার নাকে চাপা দিয়ে বলেন—বলছি কী, ভিজিট যখন দিচ্ছিই তখন আর মাগনা ছাড়ি কেন? প্রেসারটা দেখিয়ে নিই। বাবার বুকটাও পরীক্ষা করুক। তুমিও তো পরশুদিন মাথা ঘোরার কথা বলছিলে, দেখিয়ে নেবে নাকি?

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে রসিকবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বলেন—এই জমাদার। নর্দমায় ময়লা ফেলছ যে বড়? নালী আটকে যাচ্ছে না?

মাগন মুখ তুলে বলে—নালী টেনে দিব মা। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

—কেন, গর্ত করতে কী হয়? বলা হয়নি তোমাকে গর্ত খুঁড়তে? টাকা মাগনা আসে?

—হাঁ হাঁ, গাড্ডা ভী হোবে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ছ-মাস আগে ট্যাংক পরিষ্কার করানো হয়েছে, এর মধ্যেই যে কী করে ভরে যায় তা তো বুঝি না।

কথাটা গায়ে না মাখলেও হয়। কিন্তু লীলাময়ী মাখলেন।

—শুনলে?

দত্তবাবু স্টেটম্যানের মুখোশ পরে ফেলেন! লীলাময়ী মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়েন—ময়লা কি শুধু আমাদের একার? ওপরতলায় বুঝি সব দেবতারা থাকেন, তাঁরা কেউ হাগেন মোতেন না? আর জমাদারের টাকার অর্ধেক তো আমাদেরও দিতে হবে। মাগনা কাজ হচ্ছে নাকি?

রসিকবাবুর স্ত্রী নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব কথা বোঝা যায় না। শুধু স্পষ্ট করে শুনিয়ে বললেন—ঐ তো ছেলে ধরতে বিবি বেরিয়ে গেলেন। আর দোষ হল কি না আমার মিলনের। গুষ্টিশুদ্ধ তেড়ে এসেছিলেন ঝগড়া করতে। বলি, মেয়ে কোথায় যায়, কার সঙ্গে কী রকম ঢলাঢলি তার খবর রাখছে কে? সে বেলা তো চোখে তুলসীপাতা এঁটে থাকা হয়।

লীলাময়ী এখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছেন না। নাকের কাপড় কখন খসে গেছে। বড় বড় চোখে লীলাময়ী স্বামীর দিকে তাকান। মুখে কথা নেই।

দত্তবাবু এমন মুখের ভাবখানা করেন, যেন তাঁর মেয়ে বা তাঁর পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছে না। এ যেন অন্য কারো কথা। প্রচণ্ড জিদবশত তিনি কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ দাঙ্গার খবর পড়তে থাকেন। একবর্ণও বুঝতে পারেন না।

একবার ভাবলেন ডাক্তার চৌধুরিকে প্রেশারটা দেখিয়ে দেবেন।

৮

চুনুর একটা পা শুকনো কাঠি। একটা হাতও কমজোরী। বড় কষ্ট তার হাঁটা চলার। যে তাকে দেখে সে-ই দুঃখ পায়।

আর অন্যের এই দুঃখবোধটা খুব ভাল কাজে লাগাতে শিখে গেছে চুনু।

জানলার কাছে একটা সাইকেল থেমে আছে। সাইকেলের ওপর শিবাজী।

—ডলিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি পাম্প ছাড়তে। চুনু খুব ভাল মানুষের মতো বলে।

—কিন্তু আমার পিছনের চাকাটায় তো লিক বেরোলো।

—লিক? তবে ঠিক সেফটিপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। তুমি তখন মান্তুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলছ। খেলছিলে না?

—ক্যারাম?

—মিথ্যে কথা বোলো না?

শিবাজী হেসে বললে—খেলছিলাম। তুমি ডলিকে বলেছ?

—না, মাইরি, কালীর দিব্যি।

—তবে বললে কে? ডলি জানল কী করে?

—বলব সত্যি কথা একটা? কিছু মনে করবে না তো?

—বলো না।

—মান্তু। ঠিক মান্তুই বলেছে। মান্তু আজকাল ইউনিভারসিটির ঝিলে গিয়ে কার সঙ্গে বসে থাকে জানো? তপন।

—সেই বদমাশটা? গেলবারও আমাদের হাতে মার খেয়েছিল?.....এই। তোমার বাবা!

বলেই শিবাজী জানলার নিচে ডুব দেয়। পরক্ষণেই তার সাইকেলের ঘণ্টি দূরের রাস্তার দমকলের মতো ঘন ঘন রি রি রিং রি রিং বাজতে থাকে।

চুনু আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তার মুখে কোনো অপরাধবোধ নেই। বউদির চিঠি চুরির জন্য মা তাকে বকেনি। আসলে বকতে সাহস পায়নি। বাবাও পাবে না।

দত্তবাবুও জানেন চুনুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাউকেই শাসন করার ক্ষমতা নেই। এ বাড়ির কেউই তাঁর কথা শোনে না।

—এ চিঠিটা চুরি করেছিস?

ঠান্ডা গলায় চুনু বলে—বেশ করেছি। একশোবার করব।

এই মেয়ের জন্যই দত্তবাবু আর লীলাময়ী গত পাঁচ বছর এক বিছানায় শুতে পারেননি। চুনু তখন থেকেই তার মাকে প্রায়ই বলত—লজ্জা করে না তোমরা বুড়ো বয়সে একসঙ্গে শোও? কেন শোবে?

কী লজ্জা! সেই লজ্জায় লীলাময়ী দত্তবাবুকে বলেছিলেন—মেয়ে যখন চায় না তখন থাক না হয়।

দত্তবাবু গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কিছু বলেননি। লীলাময়ীই আবার নিজে থেকে বলেন—ও তো জানে ওর সাধ আহ্লাদ মিটবে না। তাই বোধহয় হিংসে।

হবে। কিন্তু সেই আক্রোশটা দত্তবাবুর যায়নি এখনো। দাঁতে দাঁতে পিষে বললেন—কী বললি?

তাঁর চেহারাটা কেমন দেখাল কে জানে—হয়তো খুবই ভয়ংকর। দত্তবাবু ধীরে

ধীরে এগিয়ে গেলেন।

ভয় পায় না, তবে এখন পেল। পিছনে হাত নিয়ে জানলার গ্রীল চেপে ধরে তবু ত্যাড়া ঘাড়ে চুনু বললে—গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি! ইঃ তেজ দেখাতে এলেন! মুরোদ জানা আছে। কই বউদিকে তো চোখ রাঙাতে পারো না, যখন মাকে যা তা বলে মুখের ওপর। তোমার উইকনেস জানি। বেশি তেজ দেখাতে এলে সবাইকে চেঁচিয়ে বলব।

দত্তবাবু অবশ হয়ে যান। ঘেমে যান। মুহূর্তের মধ্যে। মারবেন বলে হাত তুলেও ছিলেন। সেই হাত সজোরে নেমে ঝুলে পড়ল ফাঁসির মড়ার মতো।

আস্তে আস্তে ফিরে এসে স্টেটসমানের মুখোশ পরলেন।

এই সেদিন অধীপ যখন বিয়ে করবে বলে মাকে গিয়ে ধরেছিল সেদিন লীলাময়ীর কাছে সব শুনে কী রাগটাই না করেছিলেন তিনি। ছেলে তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ঢুকেই বিয়ে। পার্মানেন্ট হ। মাইনে একটু ভদ্রগোছের হোক। নইলে তো হ্যাপা সামলাতে হবে বাপকেই।

কিন্তু দত্তবাবুর ইচ্ছেয় কিছু তো হয় না এ বাড়িতে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। অধীপেরও বিয়ে হল।

নতুন বউকে দেখে ভারি মুগ্ধ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। বহুকাল এমন মিষ্টি মুখ দেখেননি। বউভাতের পরদিনই মাথাখানা বুকে টেনে বলেছিলেন—এখন তুমিই সংসারের কর্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সেই থেকে সংসারে অশান্তির সূত্রপাত।

মনের মধ্যে পাপ আছে কি?

কে জানে বাবা! কে জানে! তবে পাপের চেয়েও লজ্জা অনেক বেশি।

শ্বশুরমশাই কী একটা পিছনে লুকিয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন!

উঁকি মারলেন দত্তবাবু। দেখলেন, তাঁর নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই চপ্পল।

৯

লীলাময়ী দুটো প্রেশারের বড়ি একসঙ্গে খেলেন। বেড়েছে।

একটা ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন যেন একটু আগে। মনের ভুলও হতে পারে। তবে কান খাড়া রাখছেন।

শচীলাল স্নান সেরে এসে নিজেই আসন পেতে জল থালা আর নুন নিয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের বারান্দায়। ডাকছেন—লীলা, দিবি নাকি?

ঠিক এই মুহূর্তে লীলাময়ীর রাগ হল না। কদিন আগেও শচীলাল জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া খেতেন না। ভদ্রতাবোধ বরাবরই প্রবল। ইদানীং এই সব হচ্ছে। লীলাময়ী বললেন—বসে থাকো একটু। যাচ্ছি।

শচীলাল বসে থাকেন। দুর্গন্ধ পাচ্ছেন ঠিকই। গা করছেন না। বড় মেয়ে হিরন্ময়ী বলেছে, নিয়ে যাবে শিগগিরই। হিরন্ময়ীর অবস্থা ভাল, দুবেলা মাছ হয়, মাঝে মাঝে পোলোয়া। কতকাল পোলোয়া খান না শচীলাল!

লীলাময়ী টের পান, সুভদ্রা দরজা খুলল। প্যাসেজ দিয়ে নাতিটার পায়ের আওয়াজ ধেয়ে আসছে, কচিগলার ডাক এল—ঠানু, ও ঠানু আমরা যাচ্ছি।

সুভদ্রা গর্জায়—এই! খবরদার যাবি না। গলা টিপে মেরে ফেলব তাহলে।

ছেলেটা ফিরে যায়। একটু কাঁদে কি? লীলাময়ী উঁকি মেরে দেখেন প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুভদ্রা। ছেলের নড়া শক্ত হাতে ধরা। সাজগোজ সব হয়ে গেছে। যাওয়ার জায়গা বলতে বাপের বাড়ি। তা যাক। বাড়িটা জুড়োবে।

—লীলা দিবি? শচীলাল ডাকেন।

এবার রাগেন লীলাময়ী। চাপা গর্জনে বলে—বড়দিরও আক্কেল দেখছি। কবে থেকে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সব যে যার স্বার্থ দেখছে। এই বুড়োর হ্যাপা যত আমাকেই সামলাতে হবে বরাবর? শরীর আমার বারো মাস খারাপ থাকে! স্বার্থপর, সব স্বার্থপর।

দ্রুত পায়ে বারান্দায় গিয়ে তিনি শচীলালের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—কেন তোমার গুণধর ছেলে বাবাকে নিয়ে কদিন রাখতে পারে না? নাকি তাতে বউয়ের মাথা ধরার ব্যামো বাড়বে।

৯

উঠোনে কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে মাগন। ঘামে জবজব করছে। পায়ে কাচের টুকরো ফুটেছে একটা। সেই নখে টেনে তুলে ফেলল। কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে রক্ত লেপটে দিল।

—কী রে, দিন কাবার করবি নাকি?

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। মাগল গর্ত থেকে উঠে এসে এক নম্বর ট্যাংকিতে বালতি নামিয়ে বলে—আভি দেখে লিন, সব সাফা।

রসিরবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে এবং দত্তবাবু নিচে থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—অনেক ময়লা রয়েছে এখনো!

মাগন হাসে। বলে—ময়লা তো আছে মালিক। কিন্তু উ তো সব শুখা মাল আছে। মালটা শক্ত হয়ে গেছে বড়বাবু, উঠবে নাহি।

—নাম ব্যাটা ট্যাংকে, নেমে কোদাল মেরে চেঁছে তোল। টাকা কি গাছে ফলে?

—হাঁ হাঁ বাত তো টিক আছে বড়বাবু। লেকিল পাঁচ রুপেয়া বকশিশ দিয়ে দিবেন। চালিশ টাকার তো পসীনা চলিয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন দিবে কৌন?

মাগন ট্যাংকে নামে। গার্দা সব পাথরের মতো বসে গেছে। থকথক করছে পোকা, জল। বহোত গান্ধা।

কোদালে ময়লা চাঁচতে চাঁচতে মাগন আপনমনে বলে—কাম পুরা করে পয়সা লিব মালিক। বহোত গার্দা বাবা, বহোত গান্ধা। সব গার্দা সাফ থোড়াই হোবে বাবা। গার্দা কুছ জরুর থেকে যাবে মালিক! সব গার্দা কখনো সাফা হয় না।

ওষুধ

উকিলবাবু এখনো আসেননি। মক্কেলরা বসে বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড় অফিসার, বড় ডাক্তার, বড় উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হয়। যে যত বড় সে তত ঘোরাবে!

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল। তেষ্টা পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয়-ভয় আর লজ্জা-লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড় দোকান নয়। ছোটো মোটো। গরিবগুর্বোর দোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলা পাতি কালাপাতি চমন বাহার মোহিনী জর্দা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামী কোল্ড ড্রিংকস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশি বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে।

বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে রাখা বোতল অনেক বেছে বুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—এরকম ঠান্ডা হলে চলবে?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে—হুঁ।

লজেনচুসের গন্ধওলা ঠান্ডা, মিষ্টি ঝাঁঝালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘঁৎঘঁৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে খেতে চেয়ে আছে উল্টো দিকের বাড়িটার দিকে। না উকিলবাবু এখনো আসেননি।

কতকগুলো ব্যাপার আছে যা কেবল এই উকিল, ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে—কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায়? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড় জোর। আর চাও তো, ভাল মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয় বার বিয়েয় বসতে খুব ভেবে-চিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম সরম, ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিতে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিন কুড়ি আগে জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে রেখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু

চিরুনি দিয়ে। বাতাসে উড়ে উড়ে ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কব্জা লাগাচ্ছিল। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝল এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজী যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলেই দুর্গাপদ কটমট করে তাকাল মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানা-টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না, কোনোদিন হতও না।

—বলি ব্যাপারটা কি শুনছিস? হুংকার দিল দুর্গাপদ।

সূক্ষ্ম চিরুনিতে উঠে আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে—দেখলে তো, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

দুর্গাপদ বুঝল পুরুষকারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয় সে তো দিন রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন? তেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলী মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিজ্ঞেস করল—কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

—নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

—জামাই?

—তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফর্সা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড় বড় চোখে রক্ত হিম-করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারি ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরিজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠান্ডাচোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল, ডিভোর্স করবে নাকি?

—তাই তো লিখেছে।

—করলেই হল? আইন নেই?

—ডিভোর্সের কথা তো আইনেই আছে।

—তোমার মাথা। ডিভোর্স হল বে-আইনি ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করেছে জানতে পারলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা যা শিখে এসেছে তার ওপরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল—জেল দাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিসে যেতে।

লক্ষ্মীর মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল—আমি যাব পুলিশের কাছে? তবে তুমি পুরুষমানুষ আছো কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মার সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনি শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ঐ লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে দুর্গাপদর কাছে যতটা তার

চেয়ে ঢের বেশি তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে মেয়ের গলাগলি ভাব, গুজগুজ ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ একা পুরুষ। কী বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলে—জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানি। সব কটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা! দেশে আইন নেই। কোর্ট কাছারি নেই? পুলিশ জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিসের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কি উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গ্রাহককেও ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই, তার টাকা অঢেল। সে সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনিয়ায় নেই। একজন দুঁদে উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কি না দুর্গাপদ জানে না। প্রথম দিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিট দশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পঁচিশটা টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনো ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিব ঢিব, মুখ শুকনো, গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদী শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢি ঢি ফেলে দেবে দু-দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ। গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল—মা গো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাব, বুঝিয়ে সুজিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিনশো টাকা করে হাত-খরচ পাঠাবো তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, এলো চুলে বসে ছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ বুক ঢাকা পড়ল। বলল—মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছ? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাবো।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারি মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল—পুরুষমানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনীমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন?, ওর সম্মান নেই? জামাইদের দেমাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা পায়ে ধরে নিতে এলেও যাবে না। এ বাড়িতে বাকি জীবন বসে বসে খাবে। মেয়ে কি ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে "ও দাদা দাম দিয়ে গেলেন না" শুনে লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল—উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত-পা ধোবেন, জল-টল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল—জনা আষ্টেকের পর।

—তাহলে আরো দেড় ঘণ্টা ধরে নিন।

—বড় উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

—আসান হবে। উনি হারা মামলায় জিতিয়ে দেন। কত খুনিকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল—কিন্তু আমারটা কিছু হল না।

—আপনার মুশকিলটা কী?

—সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

—অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরো জনা ত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কা। শোনা গেল উকিলবাবু এখনো চেম্বারে আসেননি। জল খাচ্ছেন বোধহয়। গুটি গুটি আরো মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিনঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাথা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘন ঘন। তারপর ডাক এল। ব্যস্ত বড় উকিলবাবু মক্কেলদের এক দুইবার দেখে মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরোনো পরিচয় এবং বখেরার কথা বুঝিয়ে বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন—ভাঙন রুখতে চাইছেন তো? কিন্তু কী দিয়ে রুখবেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে কাকে ভালবাসে বা বাসে না, কার বিয়ে ভাঙা ভাল নয় বা কার ভাল এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি। কিন্তু খামোকা।

ফের পঁচিশটা টাকা গুনে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

২

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকম-সকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারি আহ্লাদী চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে খেতে ভ্যাক ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে—ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জি দে। এ সময়কার ঠান্ডা ভাল না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎ-সংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানও গেয়ে ফেলল সে—না মারো না মারো পিচকারী...

ঘেরা উঠোনের যে ধারটায় দেওয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এক একখানা পাতা ডবল সাইজের কুলোকেও হার মানায়। কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে ফের লেজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝাবারও চেষ্টা করল ভ্যাক ভ্যাক করে।

নবীন গান থামিয়ে বলে—কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে গেলে থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল—আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের তো হয়ে এসেছে। আজকাল বড় আলতুফালতু কথা বলে, মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে দিয়ে বাতি জ্বেলে বলে—আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাঙ তুলে ফেলল। বলল—ডিভোর্সের মামলা বড় সোজা নয় হে!

নবীন ভ্রু কুঁচকে বলল—ও পক্ষ কোনো জবাব দিয়েছে?

—জবাব এত টপ করে দেবে? এত সোজা নাকি? যা সব আর্গুমেন্ট দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মুসাবিদা করতে দুঁদে উকিলের কালঘাম ছুটে যাবে। তবে এও ঠিক কথা ডিভোর্স জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে—শক্তটাই বা কী? রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

—আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে না কি আজ?

—খরচা আবার কী? নবীন অবাক হয়ে বলে—এখনো মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

—আছে, আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কি আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড় প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে মাঝে এসে খবর দিচ্ছি এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু। মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজার দর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফীজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল—ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় দুটো টাকা দিয়ে আসবখন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, সোজা নয়। তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহারা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে—মাসোহারাই যদি দেবো তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে—সেই নিয়েই তে ভাবছি। ওরা কী কী পয়েন্ট দেবে, আর আমাদেরই বা কী কী পয়েন্ট সে সব গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর খুব অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কী? মা খুড়ি একটু ফিচফিচ করত, তা অমন সব মা খুড়িই করে। ভারি বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উল্টে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যে সব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেই সব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

—মারধর করা হয়নি তো?

—কস্মিনকালেও না। বরং ও-ই উল্টে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু একটা চটকান মেরেছি হয়তো। তাকে মারধর বলে না।

—চরিত্রদোষ ছিল কি? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

—ছিল কি আর না? তবে সে সব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে উঠতে বলে—কোন পয়েন্ট টিকবে কোনটা টিকবে না বলা শক্ত। ভাবতে হবে। তুমি বরং কাল চারটে টাকাই দিয়ে যেও।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়ে ছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারি সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভাল বলে মনে হল না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মনে হয়ে খুব আফসোস হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটা স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালত তো বড় জোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশি কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারো সঙ্গে ভেগেছে। পরে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই থেকে তার লোহা-পেটানো হাত পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়! ওপরে টিনের চালওলা পাকা ঘরের চুন-বালি গত বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা বেশির ভাগ বই-ই ডামি। ওপরে মলাট, ভিতরটা ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গতকালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অঙ্ক কষাচ্ছে। চারটে টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল—এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

৩

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা উচিত কি না ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল—সব ভাল তো?

নবীন বে-খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে—মন্দ কী?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে—এদিকে একটু বিষয় কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

নবীন ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে—ওদিকে সব ভাল?

দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে—ভাল আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছ। আমি অতশত ইংরিজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।

নবীন বিনীতভাবেই বলল—তাই লেখার কথা। ঠিকমতো লিখেছে কি না কে জানে? আইনের ইংরিজির অনেক ঘোরপ্যাঁচ।

দুর্গাপদ বলে—শুধু ইংরিজি কি, উকিলের মুখের কথাও ভাল বোঝা যায় না। দুবারে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতেই চাই।

নবীন গম্ভীর হয়ে বলে—আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।

—কারো কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বে-আইনি। পুলিস খবর পেলে জেল দেবে।

নবীন হাসল।

দুর্গাপদ করুণ নয়নে চেয়ে বলল—হাসছ বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কী ভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিল তা যদি জানতে।

লোহা-পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনীমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল—স্ট্রং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে হয়।

এ কথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল—বেশি বোলো না বাবাজীবন! তুমি নিজে পেরেছ? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!

এ কথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

৪

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ায় সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভাল লাগে না উদাস লাগে, এই যে দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারি আলাদা মনে হয়, এই যে সিনেমা দেখেও মন ভাল হতে চায় না—এই তার রোগ। ভিতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল-ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে।

সিনেমা-হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।

লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনো কাজের জন্য কখনো কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।

উঠোনে ঢুকতেই নেড়ি কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে তেড়ে এসে লেজ নেড়ে কুঁইকুঁই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।

প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েকমুহূর্ত পরেই সারা বাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।

লক্ষ্যই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড় বড় শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বলে উঠল—উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে না, বলতেই চুলের গোছায় বিভীষণ এক হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল। গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দু-নম্বর বোমার মতো। মেঝেয় পড়তেই না-পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে—কার পরোয়া করি? কোন উকিলের ইয়েতে তেল মাখতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেরেছে দুর্গাপদ দাস?

বলতে না-বলতেই আর একটা তত জোরে নয় থাপ্পড় পড়ল গালে!

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়টি হল কেউ মারেনি তাকে। এই প্রথম, কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ! মনের ম্যাদামারা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত! আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ংকর নিবিড় সম্পর্ক যে।

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে মনে কী যে আনন্দে ভেসে আচ্ছে সে!

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে! এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জুলজুলে চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার ছিল লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা ফোঁড়ার যন্ত্রণার মতো ব্যথাটা আজ যেন ফেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পর দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল—এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাপকে। মার খেয়ে মুখ-চোখ কিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ্য করল লক্ষ্মীর চোখ দুখানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ-চোখ।

লক্ষ্মী বলল—বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন?

নবীন সায় দিল—রাত হয়েছে, যাওয়ার দরকারটা কী?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লান মুখে বলল—ও বাবা, তোর মা কুরুক্ষেত্র করবে তা হলে। চিনিস তো!

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

খগেনবাবু

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সিটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সিটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে-গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কন্ডাকটর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো-ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরো সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, মাজা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশো হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয় স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায়নি তো। এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কন্ডাকটরকে দু কথা শুনিয়েছে, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না। আমাদের কি গরু ছাগল পেয়েছ, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরো ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনো সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড় ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবারে সুনসান হয়ে যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়। জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছেও না। নতুন নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে 'আহা, উহুঁ' করার আছে কে দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই একটা ভীষণ দরকার! গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাসটিকের চটি পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ায় আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম!

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমাসে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ।

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভাল করে ধরতে পারো না। ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা তাকে লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু-জোড়া চোখ থাকলে ভাল হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড় আঁচিলটা এখনো দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরো ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দুখানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীর স্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপ কাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিয়ে এক একজন জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার

বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কী যেন বলল। জয় মা। যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যতসব মেনীমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কন্ডাকটর।

বাস থেমেছে। হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে আছে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড় বড় চোখে দৃশটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা-টা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কি গো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখদিকে খগেনবাবু। তাকিও না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড় বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়! কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছ নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটলোক আর বলে কাকে।

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশিরভাগ পা-ই প্যান্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক-ফোকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে। মেয়েমানুষ কোনোকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরো কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইম মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি

যে বসেছ কচুর ওপর। কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কী আসে যায়?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে! এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্যে একেবারে আঁকুপাঁকু যে। দু দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কী যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাকো। খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনছে। ভারি লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখনি তো! জুঁই বলে।

জলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কী করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো! একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে! বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে-খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কন্ডাকটর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড় ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমনকী কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভাল চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখ। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো।

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছ। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দুবছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কী হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে! নতুন নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই।

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনও দেখছে। বিরক্তি কেটে এবারে একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই। চার-পাঁচ বছর সুখে দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্চাকাচ্চা হয়েছিল না ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধহয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নিচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে।

হোক না। দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জড়ির পাড়।

তোমাকে দেখেনি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে।

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রু কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো! বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জানো, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কী? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি

লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হৈ-চৈ নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নিচু হয়।

কী বলছ?

কারা নামল?

কী করে জানব? কত লোক নামছে উঠছে, কেন?

ওরা কিনা?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে, না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পিছন ফেরানো! ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে চাইছ কেন?

দেখি না কীরকম।

ভালই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভাল মেয়েছেলেই পাবে। তুমিও তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

রংটাই কি সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনোদিন কালো বলেনি। বরং বলত, মাজা রং-ই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।

কি জানি।

আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই তো।

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দূর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে করতে বাসটা থেমে এল। কন্ডাক্টর ছোকরা তেজী গলায় চেঁচাল বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম দুড়ুম করে লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!

জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফর্সা, খুব ফর্সা, বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কী?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কি?

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরে-সুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফর্সা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে

একটা বছরখানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিলে। বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছ! কী সুন্দর নাদুস-নুদুস!

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সিটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতলবখানা কী বলো তো! বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভালমানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফর্সা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড়ে করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নিচে ভরা বর্ষার খাল গোঁ-গোঁ কয়ে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালয় ভালয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবাঃ। বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোকা কেঁদে উঠল, হঠাৎ! লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ।

দুজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কী? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দুজনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছন বাগে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দিগম্বরের। চাপা স্বরে বলে, চিনতে পারেনি।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়েছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভাল। আমাদের চিনতে পারেনি।

বউটাকে দেখলে ভাল করে?

ও আর দেখব কী? রংটাই যা ফর্সা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড় বড় চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছ, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছ। বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দেখ ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোকে গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দুজনে ঘাস জমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ বাচ্চা দিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নিচে মাঠ পেরিয়ে গামছাডোবায় যাচ্ছে তাতে সুন্দর দেখানোর কি আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড় বউয়ের জিম্মায় আছে। বড় বউ আবার বেশিক্ষণ জুঁইয়ের বাচ্ছা রাখতে হলে চেঁচমেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াব! বলো কী? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত খোলা হা-হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোটো স্যুটকেস।

কন্ডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর.....নলতাপুর.....চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে, আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কী হচ্ছে শুনি। দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড় বড় চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোনো কালে দেখেনি দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটু অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার

মাঠের দিকে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারে নি?

বরাতজোর আর কাকে বলে! চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো।

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কী করে?

দেখেইনি ভাল করে।

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকল।

শুনেছি তো।

এত কাছে থেকে দেখেও না চেনার কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর....ওঃ গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখ! কতকাল পর...

কী কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায় মেয়েমানুষটা যত ফর্সাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কী করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো তো। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কন্ডাক্টর ঐ হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দেখ চেয়ে।

দাঁড়াও না, এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাব।

উরে বাস! বলো কি। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাব না। দেখব।

কী দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাব।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোয় মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দেখা হবে

নক্সী কাঁথার মতো বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার ওপর আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাঁওতাল মালী বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আর মনে আছে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ। সে গন্ধে ঘুমের ভেতরেও টের পেতাম, মা অনেক রাতে বিছানায় এলো। মার দিকে পাশ ফিরে শুতাম ঠিক। তখন নতুন ক্লাশে উঠে নতুন বই পেতাম ফি বছর। কি সুঘ্রাণ ছিল সেই নতুন বইয়ের পাতায়। মনে পড়ে বর্ষায় কদম ফুল কুড়িয়ে এনে বল খেলা। হাতে পায়ে কদমের রেণু লেগে থাকত বুঝি। কি ছিল! কি থাকে মানুষের শৈশবে! বিকেলের আলো মরে এলো যেই অমনি পৃথিবীটা চলে যেত ভূতেদের হাতে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া ছিল ভারি শক্ত। বিশাল বাড়িতে কয়েকটি প্রাণী আমরা গায়ে গায়ে ঘেঁষে থাকতাম। ভোরের আলোটি ফুটতে না ফুটতে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটতাম বাইরে। বাইরেটাই ছিল বিস্ময়ের। সূর্য উঠছে, আকাশটা নীল, গাছপালা সবুজ। সব ঠিক আগের দিনের মতোই। তবু অবাক হয়ে দেখতাম, মনে হতো, গতকাল ঠিক এরকম দেখিনি তো। সেই আনন্দিত ছেলেবেলায় একটা দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। আমার ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায়। মাত্র দেড় বছর আগে কাকীমা এসেছেন ঘরে। একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে! সে তখন হাত পা নেড়ে উপুড় হয়, কত আহ্লাদের শব্দ করে! তবু বউ মেয়ে দেখে ছোটকাকার মরণ ঘনিয়ে এলো। বিকেলে শ্বাস উঠে গেছে। দাদু তখন বাইরের বারান্দায় বসে আছেন। বাঁহাতে ধরা তামাকের নল, কল্কেতে আগুন নিভে গেছে কখন। সন্ধের পর জ্যোৎস্না উঠেছে সেদিন। দাদু সেই জ্যোৎস্নায় পা মেলে বসে আছেন। ভিতর বাড়িতে কান্নার শব্দ উঠেছে। বাবা আর জ্যাঠামশাইরা এসে দাদুকে ডাকলেন।

—আসুন, প্রিয়নাথকে একবার দেখবেন না?

দাদু খড়মের শব্দ তুলে ভিতর বাড়িতে এলেন। তাঁর মুখখানা একটু ভার দেখাচ্ছিল, আর কিছু নয়। ছোটকাকা তখন বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। কাকে যেন খুঁজছেন। কী যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। বারবার বলছেন—তোমরা সব চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো, আমাকে কিছু বলো।

জ্যাঠামশাই নিচু হয়ে বললেন—কী শুনতে চাও প্রিয়নাথ?

ছোটকাকা ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি কি জানি! একটা ভাল কথা, একটা সুন্দর কথা কিছু আমাকে বলো, আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেন এই বয়সে সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি—আমার মেয়ে রইল, বউ রইল—আমার এই কষ্টের সময়

কেউ কোনো সুখের কথা বলতে পারো না।

বড় কঠিন সেই পরীক্ষা। কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই কেবল মরণোন্মুখ মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই ঠোঁট কাঁপে।

একজন অতি কষ্টে বললো—তুমি ভালো হয়ে যাবে প্রিয়নাথ। শুনে ছোটকাকা ধমকে বললেন—যাও যাও—।

আর একজন বলল—তোমার মেয়ে বউকে আমরা দেখব, ভয় নেই।

শুনে ছোটকাকা মুখ বিকৃত করে বললেন—আঃ, তা তো জানিই, অন্য কিছু বলো।

কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

সেই সময়ে দাদু ঘরে এলেন। স্বাভাবিক ধীর পায়ে এসে বসলেন ছোটকাকার বিছানার পাশে। ছোটকাকা মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বলেন—বাবা, সারাজীবন আপনি কোনো ভাল কথা বলেননি, কেবল শাসন করেছেন। এবার বলুন।

সবাই নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। ছোটকাকাকে জীবনের তীরভূমি থেকে অথৈ অন্ধকারের এক সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে বলে ঢেউটা আসছে, আসছে। আর সময় নেই। ছোটকাকার জিভটা এলিয়ে পড়েছে, বার বার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ প্রবল ব্যথায় বিকৃত!

দাদু একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন—প্রিয়নাথ, আবার দেখা হবে।

কী ছিল সেই কথায়। কিছুই না। অতিথি অভ্যাগত বিদায় দেওয়ার সময় মানুষ যেমন বলে, তেমনি সাধারণভাবে বলা। তবু সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

এসব অনেকদিন আগের কথা। নক্সী কাঁথার মতো বিচিত্র শৈশবের পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সুন্দর গন্ধগুলো আর পাই না, তেমন ভোর আর আসে না। মায়ের গায়ের সুঘ্রাণের জন্য প্রাণ আনচান করে! পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে! বুড়ো গাছের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা। খসে যাচ্ছে পাতা। মহাকালের অন্তস্তলে তৈরি হচ্ছে একটি ঢেউ। একদিন যে এই পৃথিবীর তীরভূমি থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে শৈশবের একটি কথা তীরের মতো বিঁধে থরথর করে কাঁপছে আজও। সেই অমোঘ ঢেউটিকে যখনই প্রত্যক্ষ করি, মনে মনে তখনই ঐ কথাটি বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। শৈশবের সব ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শ ফিরিয়ে আনে। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ পেয়ে যেমন ছেলেবেলায় পাশ ফিরতাম তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে পাশ ফিরে শুই। মনে হয়, দেখা হবে। আবার আমাদের দেখা হবে।

ঠিক পুরুষের মতো গলায় একজন বয়স্কা নার্স চেঁচিয়ে ডাকছিল।

—অমিতাভ গাঙ্গুলি কে? অমিতাভ গাঙ্গুলি?

বাবার মুখ নোয়ানো। হাতের ওপর থুতনি রেখে বোধহয় চোখ বুজে আছে। ডান গালে স্টিকিং প্লাস্টারে সাঁটা তুলোর ঢিবি। ডাক শুনে মুখে তুলে শমীকের দিকে তাকাল। শমীক উঠে দুপা এগিয়ে থতমত গলায় বলে—এই যে এখানে।

নার্স হাতের কাগজটার দিকে চোখ রেখেই বলে—ক্যানসার। থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই।

—তাহলে? শমীক প্রশ্ন করে।

উত্তর অবশ্য পায় না। নার্স পরের নাম ধরে ডাকছে—নওলকিশোর ওঝা—

বাবা ওঠে।

—কী বলল?

শমীক যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বলে—কত ভুলভাল বলে ওরা! এর রোগ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

—থার্ড স্টেজ না কী যেন বলছিল! বাবা ধীরে ধীরে বলে।

—রোগটা প্রাইমারি স্টেজে আছে আর কি। ওষুধ পড়লেই সারবে।

হাসপাতালের বাইরে এসে শমীক বলে—ট্যাক্সি নেবো বাবা?

—ট্যাক্সি কেন আবার? তিন নম্বরে উঠে শেয়ালদা চলে যাব।

শেয়ালদার হোটেলে ফিরে বাবা তার প্যান্ট ক্রিজ ঠিক করে রেখে যত্নে ভাঁজ করল। হ্যাঙ্গারে টাঙাল জামা। লুঙ্গি পরতে পরতে বলল—থার্ড স্টেজ মানে কি প্রাইমারি স্টেজ?

—হ্যাঁ।

—তবে যে বলছিলি, ওরা ভুলভাল বলছিল।

শমীক অত বুদ্ধি রাখে না। তাছাড়া তার নিজেরও বুকের ভিতরে একটা কী যেন উথলে পড়ছে। তিনটে বোন বিয়ের বাকি। দুই ভাই ইস্কুলে পড়ে। তার নিজের বি-এ পাশ করতে এখনও এক বছর। যদি আদৌ পাশ করে। এবং এই অবস্থায় বাবাজী বোধহয় চললেন।

দুই গাল রবারের মতো টেনে হাসল শমীক। বলল—না না। থার্ড স্টেজই বলেছে। তার মানে—

বাবা বিশ্বাস করেছে। কোঁচকানো কপাল হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিছানায় পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলল—যদি প্রাইমারি স্টেজই হয় তবে হোটেলের টাকা গুনে এখানে থাকি কেন? আমাদের চা বাগানে ফিরে যাই চল। দরকার মতো জলপাইগুড়ি কি কুচবিহারে গিয়ে চিকিৎসা করালেই হবে।

—ডাক্তারকে বলে নিই।

—কালই বল। আমি বরং শিয়ালদায় আজই খোঁজ নিই যদি পরশুর রিজার্ভেশন পাওয়া যায়।

—তাড়াহুড়োর কী আছে! এসেছি যখন ট্রিটমেন্টটা করিয়েই যাব। কলকাতার মতো ব্যবস্থা কি মফস্বলে হবে?

বাবা ডান গালের তুলোটা একটু চেপে ধরল। শমীক জানে, তুলোয় ঢাকা আছে একটি ঘা। ঘায়ের ভিতর দিকে পচন। ক্রমশ গালের মাংস খসে খসে পড়বে। প্রথম ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল একজন ডেন্টিস্ট। বাবার কষের অকেজো দাঁতটা উপড়ে ফেলে শমীককে আড়ালে ডেকে বলল—দাঁতটা তুলে বোধহয় ভাল করলাম না। দেয়ার ইজ সাম পিকিউলিয়ার সোর। একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবেন।

শমীক জিজ্ঞেস করল—কেন?

—সন্দেহ হচ্ছে ক্যানসার।

—জলপাইগুড়ির বড় ডাক্তারও সেই একই কথা বলে—কলকাতায় নিয়ে যান। না হলে সিওর হওয়া যাবে না।

গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান থেকে শমীক তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

আজ নিশ্চিত হওয়া গেল। থার্ড স্টেজ মানে প্রাইমারি স্টেজ নয়। শমীক জানে। বাবা জানে না।

পরদিন বাবাকে হোটেলে রেখে একা হাসপাতালে গেল শমীক। বহু কষ্টে দেখা করল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার সব শুনে হাসলেন।

—হাসপাতালে রেখে লাভ কী? সারবার হলে নিশ্চয়ই রাখবার চেষ্টা করতাম। যে কয়দিন বাঁচেন আপনার বাবাকে আপনাদের কাছেই রাখুন। যা খেতে চান দিন, যা যা করতে চান সব করতে বলুন। মেক হিম হ্যাপি। হাসপাতালের লোনলিনেস আর ড্রাজারিতে শেষ কটা দিন কেন কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন? আমাদের কিছু করার নেই।

—আপনি সিওর যে এটা ক্যানসার?

ডাক্তার হাসলেন—ইচ্ছে করলে আপনি আর কাউকে কনসাল্ট করতে পারেন। ডক্টর মিত্রকে দেখান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবশ্য দেখানোটা সান্ত্বনা মাত্র।

রাত্রে খাওয়ার সময় বাবা অনুযোগ করতে থাকে—এরা একেই বিচ্ছিরি খাবার দিচ্ছে, তাও তুই মাছটা ফেলে রাখছিস। ভাত তো কিছুই খেলি না। এখানে এসে সাতদিনে কত রোগা হয়ে গেছিস। ভাল করে খা।

—বাবা, কাল একজন স্পেশিয়ালিস্টের কাছে যাব।

—কেন?

—ডক্টর মিত্রের খুব নাম। দেখি কী হয়।

—প্রাইমারি স্টেজ যখন, অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

—দেখানো ভাল।

—অসুখটা ওরা কী বলছে? নালী ঘা তো?

—তাই।

—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

বাবা তার গলা ভাত আর ঝোল দিয়ে চটকানো কাথের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলে—কী খারাপ রান্না এদের! কিচ্ছু গেলা যায় না। তোর মা যে সেদ্ধ ঝোল রাঁধে তারও কেমন ভাল স্বাদ।

বাবা শমীকের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে করে বলে—কাল তোকে রামদুলাল স্ট্রিটের সেই দোকানটায় নিয়ে যাব। কখনো তো খাসনি, দেখিস কেমন ভাল সন্দেশ করে ওরা! আমরা ছাত্রজীবনে দল বেঁধে গিয়ে খেয়ে আসতাম।

গতকাল নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল—'ক্যানসার'। বাবা কি সেটা শুনতে পায়নি? বায়োপসি কেন করানো হল, তাও কি বাবা জানে না? না কি সব জেনে বুঝে বাবাও অভিনয় করে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধেবেলা ডক্টর মিত্রর বিশাল বাইরের ঘরে বাপ-ব্যাটায় বসে আছে। ডাক্তার টেনিস খেলতে গেছেন। আসবেন। শ্লিপে নাম লিখে বেয়ারার কাছে দিয়ে বসে অপেক্ষা করছে আরো দশ-বারোজন লোক। বত্রিশ টাকা ফি দিতে পারে এমন কয়েকজন। শমীক বাইরে একবার সিগারেট খেতে বেরিয়েছিল। কী সুন্দর বাড়ি। সিনেমায় এ রকম দেখা যায়। সামনে লন, গাড়িবারান্দা, লবি। পেতলের ভাসে সব অদ্ভুত গাছ। লনের ঘাস এদেশের ঘাসই নয়। সিগারেট ধরিয়ে চারদিকটা দেখছিল। সফলতা একেই বলে। কত লোক কত বেশি সুখে আছে।

গায়ের ঘাম তখনো মরেনি, অল্পবয়সী সুন্দর চেহারার এবং হাস্যমুখ ডাক্তারটি চটপটে পায়ে রুগীর ঘরে ঢুকে ভিতর দিকের চেম্বারে চলে যেতে যেতে একবার রুগীদের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে গেলেন। হাসিতে বরাভয় এবং আত্মবিশ্বাস। শমীকের বুকটা ভরে ওঠে। বাবাকে সে ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে। এ তো আর হাসপাতালের বাজারি ব্যাপার নয়। এখানে ঠিকমতো পরীক্ষা হবে, বিচক্ষণ ডাক্তার ঘা পরীক্ষা করেই হেসে উঠে বলবেন—আরে দূর! এ তো সেপটিক কেস।

ব্যাপারটা ঠিক সে রকম হল না! ডাক্তারের চিঠিটা পড়ে মিত্র বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বায়োপসির রিপোর্টটাও দেখলেন। মুখে হাসিটা ছিলই, আত্মবিশ্বাসও ছিল। বাবাকে বললেন—বয়স কত?

—পঞ্চান্ন।

—ছেলেমেয়ে?

—তিন ছেলে, তিন মেয়ে। এইটি বড়।

ডাক্তার শমীকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কী করেন?

—পড়ি। বি-এ।

—আর্টস! আমারও খুব ঝোঁক ছিল আর্টস পড়ার। আমার বাবা প্রায় জোর করে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন।

এই সব কথা বললেন ডাক্তার। একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে। বললেন—এটা ডক্টর সেনকে দেবেন। প্রেসক্রিপশন যা আছে তাই চলবে।

—কিছু করার নেই? খুব আস্তে, প্রায় ডাক্তারের কানে কানে বলে শমীক। ডাক্তার হাসলেন।

রাস্তায় একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় চিঠিটা খুলে দেখল শমীক। লেখা—ডিয়ার ডাঃ সেন, দি কেস ইজ হোপলেস। প্লিজ হেলপ দিস ম্যান। মিত্র।

বাবা শমীকের কাঁধের ওপর দিয়ে চিঠিটা দেখছিল—কী লিখে দিল রে? হোপলেস! হোপলেস ব্যাপারটা কী?

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে শমীক বলে—হোপলেস নয়। লিখেছে হেলপলেস! কলকাতায় আমরা তো কিছু জানি না, তাই লিখেছে। অসহায়।

—ও। বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—বত্রিশ টাকা নিল, কোনো প্রেসক্রিপশন দিল না?

—ওই ওষুধই চলবে।

—আর বেশি ছোটাছুটি করিস না। হাসপাতাল, ডাক্তার এত কিছু করছিস কেন?

—অসুখ-বিসুখে এ সব একটু করতেই হয়।

—আমার আর ভাল লাগছে না। যা হবার হবে, চল বাগানে ফিরে যাই।

শমীক মাথা নেড়ে বলে—তাই হবে।

বাবা উজ্জ্বল মুখে বলে—ঠিক তো?

—কাল রিজার্ভেশনের চেষ্টা করব।

বাসরাস্তায় এসে বাবা বলে—এখন কোথায় যাবি?

—কোথায় আর যাব! হোটেলেই ফিরে যাই চল।

বাবা একটু হাসে। বলে—কাছেই গড়িয়াহাটা। চল একটু দোকানপসার ঘুরে যাই। সস্তায়গণ্ডায় যদি পাই তো সকলের জন্য একটু জামাকাপড় নিয়ে যাব। পুজোর তো দেরি নেই। কলকাতায় একটু সস্তা হয়।

—এখন থাক বাবা। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল!

—তোর জন্যই তো। খামোকা আজ বত্রিশটি টাকা দিলি।

—ভাল ডাক্তারকে দেখানে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

—চল, দোকানটোকান একটু দেখে যাই। গড়িয়াহাটার কাপড়ের দোকানের খুব নাম শুনি।

শমীক অগত্যা রাজি হয়। বাপ-ব্যাটায় হাঁটে গড়িয়াহাটার দিকে। বাবা গালের তুলোটা হাতের তেলোয় একটু চেপে ধরে রেখে বলে—কলকাতায় এসে তো কেবল আমাকে নিয়েই হুড়যুদ্ধ করছিস। কাল বেরিয়ে একটু একা একা ঘুরবি, সিনেমা থিয়েটার দেখবি। তোদের বয়সে কি কেবল রোগের চিন্তা ভাল লাগে! কাল বেরোস।

শমীক উত্তর দিল না।

পরদিন সকালে উঠে বাবা বলল—কলকাতায় যা শব্দ! রাতে ভাল ঘুম হয় না। বাগানে থাকতে থাকতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে নিশুতি নিঝুম না হলে চলে না। তার ওপর আবার ছারপোকা।

শমীক জামাকাপড় পরছিল। একবার রেলের বুকিং অফিসে যাবে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—ঘায়ের ব্যথাটাও হচ্ছিল।

—বিশ্রাম নাও।

—একা ঘরে কি ভাল লাগবে?

—তবে কী করবে?

—একটু বেরোব ভাবছি। কলকাতা তো আর আমার অচেনা জায়গা নয়।

—শরীর খারাপ। একা বেরোনো কি ঠিক হবে?

বাবা মাথা নেড়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—শরীর কিছু খারাপ নয়। বেশ তো আছি। কাছেই যাব, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। খগেন ওখানে থাকত।

—খগেনকাকা! তোমার বন্ধু তো!

ছেলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাবা বলে—হ্যাঁ। এখনো আছে কি না কে জানে! বিশ বছর খবর জানি না। বেঁচেই নেই হয়তো। আমাদের তো এখন সব যাওয়ার বয়স। একে একে সব রওনা হয়ে পড়ব।

শমীক বলল—খগেনকাকার ওখানে যাবেই যদি তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমি আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

বাবা একটু অবাক হয়ে বলে—তুই সঙ্গে যাবি?

—না হলে তুমি একা এই ভিড়ে যেতে পারবে নাকি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—চল।

মনে মনে হাসে শমীক। খগেনকাকা বাবার কেমন বন্ধু তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে, বাবা যৌবনবয়সে একটি মেয়েকে এসরাজ শেখাত। সেই মেয়েটির প্রতি এক প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কিন্তু বাবা তাকে বিয়ে করতে পারেনি! বিয়ে করেছিল খগেনকাকা। সে ছিল বড়লোকের ছেলে। এ ঘটনা বাবা মাকে গল্প করেছিল। মায়ের কাছে তারা শুনেছে। খগেন নামটা শুনেই পূর্বাপর মনে পড়ে গেল।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বিশাল বাড়ি। সিঁড়িতে এবং দেওয়ালের নিচের দিকে এখনো মার্বেল পাথর দেখা যায়। মস্ত দরজা হাঁ করে আছে। তবে বাড়ির শ্রী দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা পড়তির দিকে। রং চটে গেছে, জানালা দরজার পাল্লা জীর্ণ, ভিতরের চিৎকার চেঁচামেচিতে বোঝা যায় যে দু-চারঘর ভাড়াটেও বসেছে।

একজন চাকর গোছের লোক তাদের ওপরে নিয়ে গেল। চিকফেলা বারান্দা, ডানদিকে ঘুরে দরদালান। দরদালানের প্রথম ঘরটায় তাদের বসিয়ে বলল—বাবু এ সময়টায় থাকেন না। গিন্নিমাকে খবর দিচ্ছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলে—খগেন বেরিয়ে গেছে?

—আজ্ঞে!

—তাহলে গিন্নিমাকেই বলো, অমিতাভ গাঙ্গুলি এসেছে। এক সময়ে তোমার গিন্নিমাকে আমি বাজনা শেখাতাম। বললে হয়তো চিনতে পারবে।

বলেই বাবা শমীকের দিকে চেয়ে হাসে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—ছাত্রী ছিল।

শমীক সব জানে। তবু ভালোমানুষের মতো বলে—তাই না কি।

বাবা শ্বাস ফলে বলে—কতকালের কথা সব। খগেনটা সুদখোর ছিল। সুদেরই কারবার ওদের। কালোয়ারি ব্যবসাও আছে বটে, তবে টাকা খাটানোটাই ছিল আসল।

এ ঘরটা বেশ বড়। পুরোনো আমলের বড় মেহগনি টেবিল, আবলুশ কাঠের কালো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। সূক্ষ্ম সব ফুল লতাপাতা আর ময়ূরের কাজ করা বার্মা সেগুনের চেয়ার! চেস্ট অফ ড্রয়ার্সের ওপরে একটা ঢাকনা দেওয়া বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় যে এটা এসরাজ। পাশে একটা তবলা আর পেতলের ডুগী, গদিমোড়া হয়ে বিড়ের ওপর ঘুমোচ্ছে। বাবা এখনো গাঙ্গুটিয়ায় সন্ধের পর মাঝে মাঝে এসরাজ নিয়ে বসে। শমীক তবলা ঠোকে।

বাবা হঠাৎ আপন মনে মাথা নেড়ে বলল—চিনতে পারবে না বোধহয়!

—কে চিনতে পারবে না?

—কমলা। কতকালের কথা! বলে বাবা অপ্রতিভ মুখখানা ফিরিয়ে নেয়।

গালের তুলোটা হাতের তেলোয় চেপে ধরে। বলে—চেহারাও পাল্টে গেছে।

নিচের তলার ভাড়াটেদের গলার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ওপরতলাটা নিস্তব্ধ। সম্ভবত এ বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। একটা ধূপধুনোর গন্ধ আসছিস। একবার একটু পুজোর ঘণ্টা নাড়ার শব্দ এল। বাপ-ব্যাটায় বসে থাকে মুখোমুখি। শমীক বাবার দিকে তাকায় তো বাবা চোখ সরিয়ে নিয়ে দেয়ালের অস্পষ্ট পুরোনো অয়েলপেইন্টিং দেখতে থাকে! হঠাৎ আপনমনে বলে—নেই-নেই করেও এখনো অনেক আছে। এ বাড়িটার ভ্যালুয়েশনই পাঁচ-সাত লাখ টাকা হবে। অথচ সুদের কারবারীর নাকি ভাল হয় না। এরা তবে এত ভাল আছে কী করে?

শমীক একটু হতাশ হয়। পুরোনো প্রেমিকার বাড়িতে বসে আবার এ কী রকম বিষয়ী কথাবার্তা। একটু পরেই সে আসবে, কাঁপা বুক, স্মৃতি আর অধৈর্য নিয়ে বসে থাকার কথা এখন। তেষ্টা পাবে, কথা হারিয়ে যাবে, দৃষ্টি চঞ্চল হবে। এ সময়ে বাড়ির ভ্যালুয়েশনের কথা মনে আসবে কী করে?

বাবা শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে—তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক দেরি। শমীক দৃশ্যটা দেখতে চায়। বাবা যদি কণামাত্র খুশি হয়, যদি প্রেমিকাকে দেখে একটুমাত্র জীবনীশক্তি আহরণ করতে পারে, তবে শমীকের বুক ভরে যাবে। সে মুখে বলে—না। দেরি হচ্ছে না।

—রিজার্ভেশন যদি না পাস!

—পাব না ধরেই নিয়েছি। গাড়িতে যা ভিড়। না পেলে ব্ল্যাকে কিনে নেবো।

—আবার গুচ্ছের টাকা নষ্ট। কাল কাপড়জামায় অনেক বেরিয়ে গেছে।

শমীক হাসল। আবার বিষয়ী কথা! মুখে বলে—সে তো তোমার জন্যই। অত কিনতে কে বলেছিল?

বাবা অপ্রতিভ হাসে। শমীক দরজার দিকে পাশ ফিরে বসেছিল, বাবার দিকে চেয়ে। বাবার দরজার দিকে মুখ। হঠাৎ দেখল, বাবার মুখটা পাল্টে গেল। শরীরটায় একটু শিহরন কি!

শমীক তাকিয়ে মহিলাকে দেখতে পায়। মাথায় অল্প ঘোমটা, ফর্সা, সুগোল ভারী

চেহারা, মুখখানা প্রতিমার মতো সুশ্রী। তার নিজের মায়ের মতোই বয়স হবে, তবে ইনি অনেক সুখী। মুখে একটু হাসি।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। মহিলা এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

—চিনতে পেরেছ? বাবা জিগ্যেস করে।

—ওমা! চিনব না? এই ছেলে বুঝি!

—বড়জন!

—বসুন।

বাবা বসে। মহিলাও বসেন একটু দূরে, চেয়ারে। সাবধান গলায় বলেন—কবে আসা হল? গালে ওটা কী?

বাবা গালের তুলোয় হাত চেপে বলে—এর জন্যই আসা। একটা ঘায়ের মতো! ডাক্তার বলেছে, ভয়ের কিছু নয়।

—ঘা!

—দাঁত তুলে সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল।

—ও।

—তোমরা সব কেমন আছ? বহুকাল খবর বার্তা পাই না।

মহিলা হাসেন। বলেন—আপনি সেই চা বাগানে এখনো আছেন?

—হ্যাঁ। ওখানেই জীবন শেষ করে ফেললাম।

মহিলা একটা শ্বাস ফেললেন—জানি সবই।

বাবা একটা গলা খাঁকারি দেয়। বলে—খগেনের কেমন চলছে?

—ওই একরকম।

বাবা হেসে বলে—খুব বাবু মানুষ ছিল। সেই কোঁচানো ধুতি গিলে ধরা পাঞ্জাবি, আর বত্রিশজোড়া জুতো এখনো চালাচ্ছে? চুলে কলপ-টলপ দেয় না?

মহিলা মুখে আঁচল তুলে হাসি ঢাকেন। মৃদুস্বরে বলেন—কলপের দরকার হয় না। টাক পড়ে গেছে।

—পড়ারই কথা। বলে বাবা গম্ভীর হয়ে যায়। এসরাজটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলে—এখনো বাজাও?

মহিলা মাথাটা নুইয়ে দেন। মাথা নাড়েন। না, বাজান না।

বাবা চুপ করে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকেন। হলঘর থেকে দেওয়ালঘড়ির শব্দ আসে। চাকর মিষ্টির প্লেট রেখে যায়। গেলাসে জল। চা।

বাবা প্লেটের দিকে চেয়ে বলে—চিবোতে পারি না।

—কষ্ট হয়?

—হুঁ। আমার পথ্য লিকুইড।

—শরবত করে দিই?

—না।

মহিলা তবু উঠে যান। বোধহয় শরবতের ফরমাশ দিয়ে এসে আবার বসেন। ঘোমটা খসে গেছে। এখনো কী গহীন কালো চুলের রাশি!

—খগেনকে বোলো, আমি এসেছিলাম। কাল বা পরশু ফিরে যাব।

মহিলা চুপ করে থাকেন। শমীক একটা দুটো মিষ্টি খায়। চা শেষ করে। তারপর উঠে বলে—বাবা, আমি আসি?

—যাবে? বাবা তটস্থ হয়ে বলে—আমিই বা বসে থাকি কেন? খগেন যখন নেই!

মহিলা ঘোমটা আবার মাথায় তুলে শমীককে বলেন—তুমি এখন কোথায় যাবে বাবা?

—একটু কাজ ছিল।

—আমি ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। উনি একটু থাকুন এখানে, কেমন?

বাবা অপ্রতিভ হয়। শমীক এটাই চাইছিল। তার সামনে জমবে না ওদের। তার পালানো দরকার এখন। সে মহিলাকে একটা প্রণাম করে বলে—আচ্ছা। বাবার কোনো তাড়া নেই। সারাদিন তো একা।

মহিলা হাসলেন। বললেন—আমারও তাই। একা।

বলেই সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ছেলেপুলে নেই তো।

খুব ধীরে শমীক দরদালানে বেরিয়ে আসে। বারান্দা পার হয়। সিঁড়ির মুখে চলে আসে। আর সেইখানে নিস্তব্ধ সিঁড়ির মুখে চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকে। কীসের জন্য যেন উন্মুখ ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আর হঠাৎ শুনতে পায়, মৃদু একটা সুরের কেঁপে ওঠা। এসরাজ বেজে উঠল।

নিশ্চিন্তে শমীক সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

দুপুরে যখন খেতে হোটেলে ফিরেছিল শমীক তখনো বাবা ফেরেনি। শমীক তাই বেরিয়ে পড়ল। মন ভাল ছিল না। এলোপাথাড়ি ঘুরল কেবল। বাবাজী চললেন। গাছের মতো, স্তম্ভের মতো বাবাজী আর থাকবেন না। তিনটে বোনের বিয়ে বাকি, ভাইরা এখনো নাবালক। কিন্তু সে সমস্যার চেয়ে বড় হচ্ছে শোক। সংসারের অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য এখন থাকবে না। লোকটা তার প্রেমিকার বাড়িতে সকালে এসরাজ বাজাতে বসেছিল। জানে না একটা কালো হাত নালী ঘা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার বুকের সুরের উৎসের দিকে। প্রাণঘড়ির কল টিপে বন্ধ করে দেবে। নার্সটা চেঁচিয়ে বলেছিল—ক্যানসার, থার্ড স্টেজ। কিছু করার নেই। সে কথা বাবা কি শোনেনি! কিংবা ডাক্তার মিত্রের লেখা চিঠিখানায় 'হোপলেস' শব্দটাও কি দেখেনি। নিশ্চিতভাবে! বড় অবাক লাগে। লোকটা নিশ্চিন্ত মনে এস্রাজ বাজাচ্ছিল আজ সকালেও।

ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। এসে দেখল, বাবা খুব নিবিষ্ট মনে স্যুটকেস গোছাচ্ছে! তাকে দেখে আনন্দিত স্বরে বলে—আয়। কোথায় ছিলি!

—ঘুরছিলাম। তুমি দুপুরে ফেরোনি?

—না। ছাড়ে নাকি! দুপুরে খাওয়াল। ঝোলভাত মেখে নরম করে দিল, ঘোল-টোল, শরবত, ফলের রস, কত কী!

শমীক হাসে। বলে—ভাল।

বাবার মুখে একটা রক্তাভা। একটু বুঝি হাল্কা পলকা তার মন। একটা হাওয়া এসে মনের ওপরকার সব ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বলল—একটা রাগ শেখাচ্ছিলাম সেই কবে! পুরোটা তখনো তুলতে পারেনি, হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। আর শেখা হয়নি। আজ সারাদিন সেটা শিখিয়ে দিয়ে এলাম।

—ও।

—অসম্পূর্ণ একটা কাজ সম্পূর্ণ হল।

—খগেনকাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না। সে নাকি অনেক রাতে ফেরে। আমি আর বসলাম না। রাত হয়ে যাচ্ছিল।

—রিজার্ভেশন পেয়েছি বাবা। কালকের।

—পেয়েছ। বাঃ নিশ্চিন্ত! বলে বাবা খুব বেশি খুশি হয়। বলে—

—সব দিক দিয়েই ভাল হল। কী বলিস!

—হ্যাঁ বাবা।

বাবা খুব একরকম উজ্জ্বল হাসে। বিছানার ওপর ছড়ানো নতুন কেনা শাড়ি, প্যান্ট আর পাটের কাপড়, টুকটাক নানান জিনিসের দিকে মমতাভরে তাকিয়ে থাকে বাবা—জিনিসগুলো খারাপ কিনিনি, না রে? সবাই খুশি হবে।

শমীক একটু দুষ্টুমি করে বলে—কিন্তু অত দামী জিনিস কিনেছ! অত দামী জামাকাপড় তো আমরা কখনো পরি না।

—তা হোক, তা হোক। বাবা খুশির গলায় বলে—আমার তো এটাই শেষ পুজোর বাজার। এবারটায় না হয় দামিই দিলাম।

বড় চমকে যায় শমীক। একদৃষ্টে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তবে কি বাবা জানে! জেনেও বাবা স্বাভাবিক আছে? এত আনন্দ। অত খুশির মেজাজ। শমীক মনে মনে বলে, তবে কি জানে বাবা?

বাবা তার দিকে চোখ তুলে চায়। বলে—একটা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হল, বুঝলে। কমলাকে রাগটা শিখিয়ে দিলাম। মনটা বহুকাল ধরে ভার হয়ে ছিল।

বাবা চুপ করে হাসিমুখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। শমীক পরিষ্কার বুঝতে পারে, বাবার চোখ নিঃশব্দে তার প্রশ্নের জবাব দিল—জানি হে জানি!

বৃষ্টিতে নিশিকান্ত

কেচ্ছাকেলেঙ্কারির মতো বৃষ্টি হচ্ছে কদিন। জলের ফোঁটা লক্ষ অর্বুদ গুড়ুলের মতো ছুটে আসে আকাশ থেকে, মাটি ফুঁড়ে বসে যায় ভিতরে। গায়ে লাগলে ফটাস করে ফাটে। বাধা পায় নিশিকান্ত। আদিগন্ত সাদা হয়ে আছে, শীতের কুয়াশার মতো, কিছু নজর চলে না। আর সেই সাদাটে ভাবের আবডালে কী যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হচ্ছে কে জানে! উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে জগৎ-সংসার। সেই কেচ্ছাকেলেঙ্কারির কথাই বৃষ্টির শব্দে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফিস-ফাস গুজুর-গুজুর। ঐ বৃষ্টির আবডালে আবার জগৎসংসার যে থেমে আছে এমনও নয়। বেলপুকুরের বাজারে মহেন্দ্রর দর্জির দোকানে মেশিন চলছে খর্‌খর্‌ শব্দে। মুদির দোকানে দু-চারজন কাকভেজা লোক সওদা করছে। আলু-পেঁয়াজ নিয়ে ভূপেন বসেছে সূষিঅলার বারান্দায়। দোকান সব একটু-আধটু ফাঁক করে কাজকর্ম চলছে ঠিকই। কিন্তু সেটা হঠাৎ বোঝা যায় না। বৃষ্টির রকম দেখে মনে হয় মানুষজন বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব। দুনিয়ার আর মানুষ মাটির চিহ্ন রাখবে না।

বাগনানের বাস কখন বন্ধ হয়ে যায় কে জানে। এখনো চলছে। নিশিকান্ত অন্ধকার বিকেলবেলায় বেলপুকুরে নেমে পড়ে বাস থেকে। গায়ে ফতুয়া, পরনের ধুতিখানা উরু পর্যন্ত তোলা। ছাতাখানা বগলদাবা করেই নামে! এই বাতাসে বৃষ্টিতে ছাতা খুলতে ভয় করে তার! ফটাস করে উল্টে দিয়ে পুরানো ছাতার শিকটা ছরকুটে যাবে। অবশ্য ছাতা খুলতে তাকে কখনো দেখেওনি কেউ।

রাস্তাঘাট কিছু দেখা যায় না। ঝুপুস করে জলে পা দেয় নিশিকান্ত। দোলের দিন যেমন ছোঁড়ারা রঙের বেলুন ছুড়ে মারে আর সেটা ফটাস্‌ করে ফাটে, তেমনি আকাশঠাকুর ছুড়াছে তার বিদকুটে বেলুন সব। নিশিকান্তর শরীরে অ্যাই বড় বড় ফোঁটা ফাটছে। নামতে না নামতেই ভিজিয়ে একশা করে দিল। দৌড়ে গিয়ে সামনের দোকানটায় উঠে দাঁড়ায় সে। বৃষ্টির রকমটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাসটা তাকে ফেলে ইস্টিমারের মতো চলে গেল।

কোমরের কাপড়ের মধ্যে শতপাল্লার ভাঁজে সাবধানে বিড়ি আর দেশলাই মুড়ে রেখেছে। দোকানঘরের বেঞ্চটায় বসে কোমরের কাপড় আলগা দিয়ে নিশিকান্ত বিড়ি দেশলাই বের করে আনে। চায়ের দোকানদার তার দিকে বিরক্তির চোখে চায়। তার গা বেয়ে নেমে বেঞ্চ ভিজছে। নিশিকান্ত যে খদ্দের নয় একথা দোকানী জানে।

বিড়িটা জখম হয়ে গেছে। নিশিকান্ত দুধারে ফুঁ দিয়ে টিপেটুপে দেখে তারপর নিরাসক্ত গলায় বলে—আগুনটা দাও তো।

সামনে উনুন জ্বলছে, খামোখা দেশলাইয়ের একটা কাঠি নষ্ট করে কোন বুরবাক। দোকানদার অবশ্য গা করে না। তাই নিশিকান্ত উঠে বিড়িটা কেটলির পাশ দিয়ে উনুনে গুঁজে দেয়। ধরিয়ে আবার জুত করে বসে। তাড়া নেই। মহেন্দ্র দর্জির দোকানে আধবোতল চুয়া রাখা আছে, গতকাল মহেন্দ্র কলকাতা থেকে এনে রেখেছে, আজ

নিয়ে যাওয়ার কথা। এই বৃষ্টি বাদলায় সে কাজটা নিশিকান্তকে দিয়ে না করালেই চলছিল না বউমণির। নিশিকান্ত বসে থাকে—এটা তার সহ্য হয় না। আজ দুপুরের কথাই ধরা যাক এমন বাদলায় কার যে ডাব খেতে ইচ্ছে করে তা জন্মে জানে না নিশিকান্ত, কিন্তু বউমণির করল। তিনদিন রাতে খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে নাকি ধাত গরম হয়েছে। বৃষ্টি মাথায় সাঁই সাঁই বাতাসের মধ্যে নিশিকান্তকে উঠতে হল গাছে। ভিজে ভিজে পিছল হয়ে ছিল গাছ। পা হড়কে কয়েক হাত নিচে পড়েছিল সে। ঘষটানিতে বুকের নুনছাল উঠে গেছে খানিক। এখনো জ্বালা করছে। দুটো বোঁটা আল্‌গা ঝানু ডাব খসে পড়েছিল। লুকিয়ে নিশিকান্ত সে দুটোর মুখ কেটে ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে লেইটাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। লেই মেশানো ডাবের জল মিষ্টি ঘোলাটে একটা শরবতের মতো হয়ে যায়, তার ভারী স্বাদ। সেই শরবত খেয়ে খোলা দুটো ছুড়ে পুকুরে ফেলেছিল সে। তারপর বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে দেখে পুকুরের ছাপানো জলে ভেসে ভেসে ডুবন্ত মানুষের দুটো মাথার মতো কোন দেশান্তরে চলে গেল। এই ঝাপসা বৃষ্টির বেলায় পৃথিবীটা কত ছোট্টটি হয়ে এসেছে, তবু কালো মেঘের ছায়ায় এখনো কত নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো জায়গা আছে। জল থেকে খুদে মাছ উঠে আসছিল, বাবলাতলায় কৈ-মাছ বেয়ে উঠে এসেছে, ভেজা গাছের ডালে বসে কাক খা-খা করে। নিশিকান্তর তখন কত কী মনে পড়ি-পড়ি করে। কিন্তু আদতে কিছু তেমন মনে পড়ে না তার। নিশিকন্তর ঐ হচ্ছে রোগ!

অন্ধকারে টর্চবাতি জ্বেলে চলার মতো নিশিকান্তর অবস্থা। টর্চবাতির যেটুকু আলো হয় সেটুকু গোলপানা আলোয় একটুখানি দেখা যায় মাত্র। সামনেও হাঁ করা অন্ধকার পিছনেও হাঁ করা অন্ধকার। অর্থাৎ নজর চলে না। নিশিকান্তর হাতেও তেমনি এক টর্চবাতি ধরিয়ে অন্ধকার দুনিয়ার দিগদারীতে পাঠিয়ে দিয়েছে কে। যেমন তার বিস্মরণ তেমনি তার ভবিষ্যৎ চিন্তা। ভাবতে বসলেই নিশিকান্তর কাছে তার জীবনটা এক ঝাপসা বাদলদিনের মতো লাগে, পৃথিবীটা ছোট্টটি হয়ে যায়। নজর চলে না বহুদূর পর্যন্ত। কে তার বাবা-ঠাকুর্দা, কোথায় তার বাড়ি ঘর, কি তার জাতগোত্র এ নিশিকান্তর জানা নেই। লোকে বলে সে হল হাবাগোবা মানুষ। তাই হবে। তবু নিশিকান্ত খুব ভাবতে ভালবাসে। যেমন সেই ডাবের খোলা দুটো কোথায় হারিয়ে গেল, কোন বিশাল বিশ্বসংসারে চলে গেল ডুবন্ত মানুষের মাথার মতো ডাব দুটো তা নিশিকান্ত ভাবতে বসে।

ট্যাকে চুরি করা দু-চার পয়সা তার থাকেই। হঠাৎ চায়ের একটা দমকা গন্ধ আর সেই সঙ্গে হাওয়ায় উনুনের একটু তাপ উড়ে এসে গায়ে লাগতেই নিশিকান্ত নড়েচড়ে বসে। তারপর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে—দাও তো এক ভাঁড় তোমার চা। খেয়ে দেখি।

দোকানদার উনুনটা খুঁচিয়ে একটু আঁচ তুলছিল। একটা ডেকচিতে আলু-পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রেখেছে, বোধহয় এক্ষুনি কেটলি নামিয়ে রাতের রান্নাটা সেরে রাখত। নিশিকান্তর কথা শুনে ফিরে তাকাল, তারপর চায়ের গুঁড়ো ঢালতে লাগল খয়েরি ন্যাকড়া-দেওয়া ছাঁকনিতে।

নিশিকান্ত বেঞ্চ থেকে উনুনের ধারটিতে আগুনের তাপে তেতে-ওঠা চৌহদ্দির মধ্যে এসে উবু হয়ে বসে। অল্প অল্প করে চায়ে চুমুক মারে, গরম ভাঁড়টা মাঝে মাঝে চেপে ধরে ঠান্ডা গালে। কিছুই মনে পড়ে না, তবু কত কী যে মনে পড়ি-পড়ি করে

তার। আধবোতল চুয়ার জন্য পলতাবেড়ে থেকে মাইল দেড় হেঁটে শিবগঞ্জ বাগনানের বাস ধরে সে যে এতটা পথ এসেছে এই বাদলায়, তাতে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। এ সময়টায় ঘরে থাকলে তাকে বউমণির টোকার সঙ্গে হয় মাছ ধরতে পাঠাত, নয়ত সাঁজাল দিতে। কিছু একটা করাতই। কিন্তু বাদলায় দোক্তা ফুরিয়েছে। বিকেলের আগে তামাকপাতা সেঁকা হয়েছে, ভাজা হয়েছে ধনে আর মৌরি। বিপিনবিহারী হামানদিস্তা নিয়ে বসেছে, দুমদাম শব্দে গুঁড়ো করছে সব। চুয়া মিশিয়ে বউমণি খাবে। ভাজা মশলার মাতলা মিঠে গন্ধে বর্ষার ছাতকুড়োপড়া গন্ধটা চাপা পড়েছে। কিছু গন্ধ আছে ভালোবাসার, যেমন গন্ধ গোলাপে, বকফুলের ভাজা বড়ায়; সোঁদা স্যাঁতা মাটিতে। আবার কিছু নেশাড়ু গন্ধ। যেমন গন্ধ কেয়াফুলে, কিশোরীর ঘেমো শরীরে, ভাজা দোক্তাপাতায়। এমন কত গন্ধ যে হঠাৎ উড়ে আসে। তুলসীতে আর চন্দনে এক রকম ভগবানের গন্ধ আছে। পুরোনো পুঁথির পাতায় পাওয়া যায় কতকালের মন কেমন করা গন্ধ। সব গন্ধ ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই বর্ষার গন্ধটা যেমন। বড্ড মন খারাপ করে দেয়।

এই বর্ষায় ঘরের বার হওয়া মানুষের বড় তাড়া। একজন ছাতা-মাথায় গেরস্ত লোক ওপাশের দোকানে দৌড়ে এল কোল কুঁজো হয়ে, এক ঠোঙা মুড়ি কিনে আবার কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পেরোয়। ভাবগতিক দেখে মনে হয় ঘরে ঢুকেই হড়াস করে দরজা দিয়ে ঘড়াক করে হুড়কো তুলে দেবে। নিশিকান্ত একটুখানি হাসে। জগৎসংসারে মানুষের কত আড়া থাকে। নিশিকান্তর নেই, তাই বউমণি বকে বকে হয়রান। সারাদিন কোথাও বসে নিশিকান্ত একটু যে ভাববে তার উপায় নেই! কানে পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিলে নিশিকান্তর ভাল সব ভাবনা-চিন্তা আসে। মাদার গাছটার তলায় বসে শুকনো উদাস দিনে নিশিকান্ত নিরিবিলি কানে পালক দিয়ে যখনই ভাবতে বসে তখনই বউমণির হাতে একটা লাটাইয়ে সুতোয় ঠিক টান পড়ে। ডাকে—নিশি...ই। নিশি অমনি চিন্তার শূন্যে উড়তে উড়তে টান খেয়ে চমকে ওঠে। ভাবনা-চিন্তা সব লাট খেয়ে যায়।

সওদা করতে গিয়ে নিশিকান্ত ঠিকঠাক হিসাব মেলাতে পারে না। বউমণি নিয়ম করেছে অঙ্ক শিখতে হবে। বিপিনবিহারীর তাই আজকাল রাতের দিকে তাকে হিসাব শেখানোর ঝোঁক চাপে। বলে—বল দেখি দু টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা থেকে এক টাকা আশি পয়সা বাদ দিলে কত থাকে? তখন তার দুনিয়াটাই কেমন ঝাপসা হয়ে যায় এই বাদলা দিনের মতো। কত থাকে! তাই তো! কত থাকে! দুটাকা পঁয়তাল্লিশ থেকে এক টাকা আশি বাদ দিলে অনেক থেকে যায় মনে হয়। নাকি কিছুই থাকে না! দশটা বিড়ির দাম যদি হয় পাঁচ পয়সা, একটা ম্যাচিস দশ....তাহলে....কত যে থাকে। বাদ দিতে গিয়ে জান কাঠকয়লা হয়ে যায়। আর তখন গাঁট্টা মারে বিপিন। বলে—তোর কত বয়স খেয়াল আছে!

—হুঁ-উ! নিশিকান্ত বলে—দেড় কুড়ি।

—দূর ভূত, এক কুড়ি তো টোকারই বয়স! তুই তো আমার চেয়েও বড়। পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হবিই।

তাই হবে! বয়সের হদিস জানলে এ দশা হবে কেন তার!

আবার কিছু খারাপও সে নেই। বিস্মরণ হওয়াটা যে মন্দ সে টের পায় না। বেশ আছে। টর্চবাতির আলোয় যেটুকু দেখা যায় সেটুকু দেখে দেখে সে চলেছে ঠিক। আজ যা ঘটে তা বড়জোর এক হপ্তা সে মনে রাখতে পারে, তার ওপারে সাদা বৃষ্টি সব ঢেকে রাখে। বিস্মরণ হচ্ছে ঠিক টর্চবাতির আলোর চৌহদ্দির বাইরের অন্ধকারের মতো, বাদলা দিনের মতো।

চা-টা খেয়ে উঠে পড়ে নিশিকান্ত। সবাই জানে সে হচ্ছে একটু মাঠো লোক— ধীর স্থির, ঢিলাঢালা। কিন্তু তা বলে যে ইচ্ছেমতো কোথাও বসে থাকবে তার উপায় নেই। লাটাই বউমণির হাতে, সে হচ্ছে এক লাতন ঘুড়ি। যত দূরেই যায় নিশিকান্ত হঠাৎ হঠাৎ চমকা টান টের পায় সুতোর। লাট খায়। ঠিক যেন বউমণি ডাকে— নিশি-ই।

ছাতাটা না খুলেই সে বৃষ্টির জলে ছপাৎ পা ফেলল। যা বাতাস! ছাতা খুললে রক্ষে আছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাত থেকে।

এখানকার মাটি বেলে, তাই তেমন পিছল নয়। তবু দু একবার পা হড়কায় নিশিকান্তর। চবাস চবাস করে বৃষ্টি চাবকাচ্ছে, মাথা মুখ ফুটো করে দিয়ে যাচ্ছে রে বাবা! জলে ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি, কান বন্ধ। আবছা আবছা দোকানঘর, মানুষজন দু-একটা দেখা যায়। জগৎসংসার যেন বা থেমে গেছে দম ফুরানো ঘড়ির মতো।

মহেন্দ্র তার অবস্থাটা চোখ তুলে দেখে। দর্জি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত কাপড় নিঙড়ে নেয়, পিরানটা খুলে জল চিপে মাথা গা মুছতে থাকে। ছাতাটা আগাগোড়া খোলেনি সারা রাস্তা, তবু ছাতাটা ভিজে গেছে। মহেন্দ্র হেঁকে বলে— ছাতা বাইরে রাখ, তুমিও বাপু ছাঁচলায় দাঁড়িয়ে গায়ের জল ঝরিয়ে এসো। এ বাদলায় ঘর যদি ভেজে তো শুকোবে না।

তাই করে নিশিকান্ত। দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেন্দ্র কল চালাতে চালাতে বলে—ছাতাটা তো সারা জীবন বগলেই দেখলাম। কোনোদিন খুলেছ?

—খুলি মাঝে মাঝে, রোদে শুকোতে যখন দিই।

মহেন্দ্র হাসে। বলে—নিশি, ছাতাটা তো ভোগে লাগালে না। তবে কেন বয়ে বেড়াও হে?

—কাজে লাগে। নিশিকান্তর উদাস উত্তর।

মহেন্দ্রের শাগরেদ গুপে পাটির ওপর বসে একটা জামার কলার ঠিকঠাক করছিল। সে দাঁতে কামড়ানো ছুঁচটা বের করে হাসল, বলল—কাজটা কী?

—সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাতেই কাজে লাগে।

গুপে আর মহেন্দ্র নিজেদের মধ্যে একটু চোখ ঠারাঠারি করে।

নিশিকান্ত দাঁড়িয়েই থাকে। ঐ তার স্বভাব বলা যায়। সময়ের জ্ঞান থাকে না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দরকার তা বিচার করতে পারে না। একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করে। বর্ষায় ম্যাচিসের কাঠি সব ম্যাদা মেরে গেছে, ঠুকলেই বারুদ খসে যায়। অনেক কষ্টে অবশেষে ধরে ওঠে বিড়িটা। মিয়ানো গলায় বলে—জিনিসটা দিয়ে দাও, বেলাবেলি চলে যাই।

মহেন্দ্র সেলাই করতে করতে বলে—যাবে যাবে। একটু বসে যাও। জলটা ধরে যেতেও তো পারে?

বসতে বলায় নিশিকান্ত বসে। চৌকাঠের কাছে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে বলে—আর ধরেছে।

এইটুকু বলেই তার কথা ফুরোয়। আর কিছু ভেবে পায় না। মানুষে মানুষে যে কত কথা বলাবলি হয়! বাসে আসতে সামনের সীটে দুই হাটুরে বসে তাদের বিকিকিনি, লাভালাভ, বাজার এবং ভগবান নিয়ে কত কথা বলে গেল। মানুষের মাথায় কথাও আসে বাবা, যেন শেষ নেই। নিশিকান্তর মাথায় আসে না। আবার এও ঠিক যদিই বা দু-চারটে কথা তার প্রাণে আসে তো তা শোনারও লোক নেই। কথা বলার জন্য, প্রাণ ঢেলে কথার বাদলা নামিয়ে দেওয়ার জন্য এক একবার তার বিয়ের ব'ই চাপে। সুন্দরপানা মেয়েছেলের সঙ্গে ফুলের মালা বদল করে হ্যাজাকের আলোয় বিয়ে—সে ভারি একটা রহস্যময় আমুদে ব্যাপারও বটে। তার ছাতাটার সঙ্গে এমনি এক বিয়ে-পাগলামির গল্প জুড়ে আছে। মায়াচরের কাছে সেবার ভীমপুজো দেখতে গিয়ে নিশিকান্তর আলাপ এক জোচ্চোরের সঙ্গে। অনেক কথা বিস্মরণ হয়ে হয়েও যে দু-চারটে তার মনে আতরের তুলোর মতো গন্ধমাখা হয়ে থাকে বহুদিন বাদেও, তেমনি কোনো কোনো কথা মনে থেকে যায়। জোচ্চোরটা নিশিকান্তকে প্রথম নজরেই জরিপ করে নিয়েছিল। ভীমের বিশাল মূর্তি জরাসন্ধকে পেড়ে ফেলে ঠ্যাং ফাঁক করে চিরে ফেলে বধ করছে, এ দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল সে। জোচ্চোরটা তার ভাবসাব দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে চা-সিগারেট খাওয়ায়। দু-চার কথার পর নিশিকান্তর বিয়ের ইচ্ছেটা জানতে পেরে বলে—পুরুষ মানুষের আবার বিয়ের ভাবনা, চাকর-বাকর মুনীশ-মুটে ভিখিরি যাই হও বউ ঠিক জোটে।

ভীমপুজোর মণ্ডপ থেকে পুরো পাক্কা তিন ক্রোশটাক হাঁটিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিল মেয়ে দেখাবে বলে। আর ততক্ষণে নিশিকান্তর চুরি করে জমানো পয়সা ফাঁক করেছিল বিস্তর। বিয়ের আশায় নিশিকান্ত 'না' করেনি। লোকটা ফুলুরির দোকানে দাঁড়িয়ে যায়, সিগারেট কেনে, দু-চারটে বাজারহাট সারে, নিশিকান্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হয়রান। তার ওপর ধার বলে পয়সা নিয়ে নিয়ে নিশিকান্তর ট্যাক ফাঁক করেছিল লোকটা। একটা অচিন গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কোঠাবাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বলল—এই হচ্ছে আমার বাড়ি। নিজের বাড়ি বলে মনে করে নাও। যাও ঐ বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো, আমি আট্টু বাজার ঘুরে সেরটাক মাংস নিয়ে আসি, মস্ত একটা খাসী কেটেছে শুনলাম। খাসীর তেলের বড়া খাও তো?

খুব খায় নিশিকান্ত। তাই ঘাড় নেড়েছিল। তখন বেশ দুপুর হয়ে গেছে। লোকটা বলে—আজ এবেলা থেকেই যেতে হবে তোমাকে, ওবেলা মেয়ে দেখিয়ে দেবো, তারপর পাকা কথা বলে যেও।

নিশিকান্ত খুব রাজি। লোকটা চলে যেতে সে দিব্যি কোঠাবাড়ির বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। চেয়ার-টেয়ার পাতা ভাল বন্দোবস্ত। বসে থাকতে থাকতে কিছু বাদে সেখানে এক খিটকেলে বুড়ো এসে হাজির। কী চাই, কাকে চাই প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলল। খ্যাঁচাকল আর বলে কাকে। জোচ্চোরটার নামও মনে রাখেনি নিশিকান্ত, কেবল

বলে—এ বাড়ির কর্তাই আমাকে বসতে বলে গেছে গো! বুড়োটা খ্যাঁকশিয়ালের মতো হুয়া হুয়া শব্দ করে বলে—বাড়ির কর্তা তো আমি, নিতাইহরি গোঁসাই। নিশিকান্ত তখন গম্ভীর হয়ে বলে—তাহলে তোমার ছেলেই হবে, আমাকে বসিয়ে রেখে বাজারে গেল মাংস আনতে, খাসীর তেলের বড়াও খাওয়াবে বলেছে দুপুরে। বুড়ো তখন তেড়ে মারতে আসে—বৈষ্ণবের বাড়িতে খাসীর মাংস। বেরোও, বেরিয়ে যাও।

কোথায় একটা ধন্ধ থেকে গিয়েছিল, তাই সবটা না বুঝেই বেরিয়ে এসেছিল নিশিকান্ত। কোঠাবাড়ির বারান্দায় ছাতাখানা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কার ছাতা, কোথা থেকে এসেছে এতসব জানার দরকার মনে হয়নি তার। হাতটানের স্বভাবের দরুন অভ্যাসমতোই নিশিকান্ত ছাতা বগলে করে বেরিয়ে এসেছিল।

জগৎসংসারে এই ছাতাখানার বাবুগিরি ছাড়া আর বেশি কিছু নেই। যক্ষীর মতো সে ছাতা আগলে থাকে। রোদে জলে খোলবার জন্য নয়, কেবলমাত্র বাবুগিরির জন্যই বয়ে বেড়ায়। ছাতার ইজ্জতই আলাদা।

—শুনতে পাই, তোমার ছাতার সঙ্গে নাকি তোমার কথাবার্তা হয় নিশি। মহেন্দ্র একখানা পায়জামার পা টানাসেলাই করতে করতে বলে।

নিশিকান্ত লজ্জা পেয়ে যায়। মুখে বলে—দূর, বিপিনদার যতো বানানো কথা।

—না গো, বানানো হবে কেন। বিপিন নিজে কানে শুনেছে, নিশুতরাতে উঠে বসে তুমি ছাতাকে তোমার দুঃখের কথা বলো, আর নাকি ছাতাও তোমার কথার সব জবাব-টবাব দেয়! ছাতার গলার স্বর নাকি একটু খোনা-খোনা, কিন্তু কথা ভারি পরিষ্কার!

গুপে ছুঁচ হাতে চেপে কলারটা পাট করতে করতে বলে—হ্যাঁগো নিশিদা, তোমার ছাতাটা মেয়ে না ছেলে!

—আমি ওসব জানি না বাবু। তোমরা বড় দিক করো। জিনিসটা দিয়ে দাও চলে যাই।

—কথাটা চেপে যাচ্ছ নিশিদা, কিন্তু সেই পলতাবেড়ে থেকে বাগনান তক্ সবাই জানে যে তোমার ছাতাটা মেয়েছেলে।

—যাঃ।

—মাইরি। গুহ্য কথা আমাদের না হয় না বললে, কিন্তু ভাব ভালবাসার কথা হচ্ছে আতর এসেন্সের মতো, চেপে রাখা যায় না। ছড়াবেই।

মহেন্দ্র পায়জামার পা খানা সরিয়ে রেখে আর একখানা পায়ের পট্টি মারতে লাগে, বলে—কথা আরো আছে। শুনি ঐ ছাতাখানার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

—যদি হয় তো নেমন্তন্নটা কোরো বাপু। বলে গুপে।

নিশিকান্ত তেতে উঠে বলে—পেছুতে লাগবে তো চললাম বলছি। গিয়ে বিপিনদাকেই পাঠিয়ে দেবখন।

মহেন্দ্র গুপেকে একটা ধমক দেয়—তোর যত ইয়ার্কি কথা। বসো নিশি, রাগ করো না।

নিশিকান্ত বসে। দেরি হচ্ছে। একটা হাই তোলে সে। মহেন্দ্রর কলখানা দেখতে তার বড় ভাল লাগে। কলকব্জা এক আশ্চর্য জিনিস। কোথাও কিছু না, পায়ের নিচে

একখানা পাটা নড়ছে আর ওপর খাপে ছুঁচখানা বৃষ্টির ফোঁটার মতো কপাকপ নেমে এসে সেলাই ফেলে যাচ্ছে।

বড় আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা! কলখানা যতবার দেখে ততবারই তার ভিতরে একটা কী যেন মনে পড়ি-পড়ি করে। পড়ে না অবিশ্যি। ওটাই তো তার রোগ। বড় বিস্মরণ। তার মনখানা বাদলা দিনের মতো, টর্চবাতির আলোর মতো। কতকটা দেখা যায়, বাদবাকি সব বিস্মরণের বাদলায়, কালিঢালা অন্ধকারে ঢাকা।

বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল তার। গুপে ডেকে তোলে তাকে। চুয়ার বোতলটা হাতে দিয়ে বলে—দিনক্ষণ দেখে বিয়েটা সেরে ফেল বাপু। আইবুড়ো মেয়েছেলে নিয়ে রাতবিরেতে বসে থাকো, এ ভাল কথা নয়। ছাতারও তো সমাজ আছে।

বোতল নিয়ে নিশিকান্ত উঠে পড়ে। দরজার কোণে ছাতাটার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেখে, নেই।

—ই কী! নিশিকান্ত বলে ওঠে।

মহেন্দ্র গম্ভীর মুখ তুলে বলে—কী হলো!

—ছাতাখানা!

—নেই?

—না। তোমরা লুকিয়েছ।

—আমরা! গুপে হাঁ করে চেয়ে থাকে বলে—পরের মেয়েছেলে লুকোব আমাদের তেমন ভাবো নাকি!

—ছাতাটা কী হল রে গুপে? মহেন্দ্র নিরীহ মুখে জিগ্যেস করে।

—হবে আর কী! একটু আগে কতগুলো লোধা মেয়েছেলে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড়িয়ে এসে উঠেছিল। এ ঠিক তাদের কাজ। নিশিদা ঢুলছিল তখন, খেয়াল করেনি।

নিশিকান্ত ক্ষেপে গিয়ে বলে—দিয়ে দাও বলছি।

গুপে বলে—তোমার ছাতারও স্বভাবের বলিহারী। কোন আক্কেলে তোমার মতো ভালো মানুষটাকে ছেড়ে না বলে-কয়ে চলে গেল।

ভারি রেগে যায় নিশিকান্ত। ডাক হাঁক করে গাল পাড়ে—তোমরা দুটো চোরের ব্যাটা, গর্ভস্রাব.....

গুপে গম্ভীর মুখে বলে—তা মুখ খারাপ করলে কী হবে! লোকে যে বলে তুমি ছাতা চোর। আমি অতশত জানি না বটে, কিন্তু শুনেছি ঐ ছাতা মেয়েছেলেটাকে তুমি মায়াচরের কোন গেরস্থর ঘরে থেকে ভাগিয়ে এনেছ!

নিশিকান্তর মাথার মধ্যেটা ভারি বেসামাল হয়ে যায়, বলে, কোন রাঁড়ীর ব্যাটা বলে, কোন্.....ইত্যাদি।

মহেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলে—মুখ খারাপ করবে না বলছি। দিয়ে দে গুপে ওর ছাতাখানা। খিস্তির চোটে জল গরম করে দিল।

রেগে গেলে নিশিকান্ত এরকম। হাট মাঠ ঘুরে যা গাল শোনে তার কিছু মনে রাখে সে। কারণ, ঐ হচ্ছে তার অস্ত্রশস্ত্র। লোকে তাকে দিক্ করলে তাকেও তো কিছু করতে হয় তখন!

গুপে উঠে চৌকির তলা থেকে ছাতা বের করে দিল। তারপর আচমকা পিছনে একটা লাথি দিয়ে বলল—বেরো শালা!

লাথিটা খেয়ে দরজাটা ধরে সামলে নেয় নিশিকান্ত।

—এ-ই-ই....বলে মহেন্দ্র চেঁচিয়ে উঠে—মারিস না। আর একটু হলে বোতলটা হাত থেকে পড়ে ভাঙত।

—শালার বড় মুখ। গুপে বলে রেগে।

নিশিকান্ত তখন গুপের মা বাবা তুলে নোংরা খিস্তি দিয়ে বেরিয়ে আসে। গুপে অবশ্য ছাড়ে না। দৌড়ে এসে ঠাঁই করে মাথায় একটা কী দিয়ে মারে। ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে নিশিকান্তর মাথা। সে বোতলটা অবশ্য চেপে রাখে বুকে। ভাঙলে বউমণি আর বিপিন তো আর গুপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে না। মেরে তারই গা-গতর ব্যথা করে দেবে। নিশিকান্ত রাগে অন্ধকার হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে চেঁচায়—গু খা, গু খা, রাঁড়ীর ছেলে....

গুপে আবার বেরিয়ে আসে। দূর থেকে একটা মাটির ভাঁড়ই বুঝি ছুড়ে মারে তাকে। নিশিকান্তর বুকে এসে লাগে সেটা। নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল দিতেই থাকে—আমার পা খা, বাঁ হাত খা, হাগা খা.....

অনেকক্ষণ ধরে বকে বকে নিশিকান্তর মাথা ফর্সা হয়ে গেল। আসলে কাকে বকছে সেটাই ভুলে গেল সে। কী হয়েছিল তাও মনে পড়ে না আর। তখন নিশিকান্ত ভারি অবাক হয়ে চুপ করে যায়। কার ওপর রেগে গিয়েছিল, কেন গাল দিচ্ছিল কিছুই তেমন মনে পড়ে না।

এদিকে বৃষ্টি থেমে চাঁদ উঠে গেছে কখন। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে! অবাক নিশিকান্তর ভিতরে একটা সুতোর টান লাগে। লাটাই বউমণির হাতে। নিশিকান্ত-ঘুড়ি তাই চমকে ওঠে, লাট খায়। বউমণি নিশ্চয়ই ডাকছে—নিশি-ই।

খাড়ুবেড়ের মোড়ে যখন নামল নিশিকান্ত তখন পৃথিবীটা বড্ড অদ্ভুত হয়ে আছে। কী এক ভূতুড়ে চাঁদ উঠেছে আজ আকাশে। চারধারে মেঘের কালি, তার মাঝখানে ফ্যাকাশে একটা ডুম। বারবার মেঘ ডাকছে পাথর-ঘষা শব্দে। তিনদিন বাদে বৃষ্টি এই ধরল। জাড়ের মাস নয়, তবু কেমন শীত ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশঠাকুর। জলে জলময় পৃথিবীটা সাদাটে হয়ে পড়ে আছে অলক্ষুণে জোছনায়।

যেমন ভয় ভূত প্রেত বেহ্মদৈত্যকে, তেমনি ভয় বিপিনবিহারী আর বউমণিকে। খালধারে পিছলমাটি ধরে প্রাণপণে হাঁটে নিশিকান্ত। মাথায় একটা টাটানো ব্যথা! মাজায় ব্যথা। কখন কোথায় লাগল ঠিক খেয়াল করতে পারে না সে।

তিনদিন ধরে লক্ষ হাত দিয়ে মাটিকে মেখেছে আকাশ। মাখাজোখা হয়ে তাই ভূতুড়ে জোছনায় সিঁটোনো পৃথিবীটা পড়ে আছে। মেখেছিল বিপিনবিহারীও বউমণিকে। বর্ষা বাদলায় কাজকর্মে বড় সংক্ষেপ! হাঁড়িকুড়ি ছাড়া আর কিছু সকড়ি করেনি বউমণি। কলাপাতা কেটে হড়হড়ে খিচুড়ি ঢেলে খাওয়া। ঘাটলার কাজ ছিল না, কাচাকুচি ছিল না, রোদে দেওয়া জিনিস টানা-টানি করা ছিল না। ঘরমোছা ছিল না। বউমণি তেপহর বিছানায় পড়ে থাকত। বিপিন মাঠে একটু চাষের কাজ দেখে এসেই দরজায় হুড়কো তুলে দিত। ভিতরে কী হত তা কি আর বোঝে না নিশিকান্ত! সেও ঐ মাখামাখিরই

ব্যাপার। বিকেলে আমতেল দিয়ে মাখা মুড়ি কাঁচালঙ্কা কামড়ে খেয়ে বিপিন যেত বাজানিদের বাড়িতে, ধর্মকথা শুনতে।

কিন্তু ধর্মকথার আগেও কথা থাকে, পরেও কথা থাকে। বৃষ্টি বাদলায় সেইসব কথাই কলঙ্কের কথার মতো ছড়িয়ে গেল। চারধার ফিসফাস গুজগুজ। নিশিকান্ত একা একা হাসে।

খালধারে একটা আগুন জ্বলছে বিশাল। আগুনের ধারে কালো কালো লোকজন। বাবলাগাছের আড়ালে বড় বড় সব ছায়া নড়াচড়া করছে! নিশিকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে যায়। দূর থেকে কাণ্ডটা দেখে আর তখন একটা পোড়া ঘিয়ের বদ গন্ধ উড়ে আসে। আর আসে চামড়া পোড়া চিমসে মতো গন্ধ।

নিশিকান্ত মাথা নেড়ে আবার হাঁটে। নেতাইয়ের ঠাকুমাটা মরল বোধহয়। জোর কদমে হেঁটে চলে আসে আগুনটার কাছে। বাঁধা শ্মশান বলতে কিছু নেই এখানে, যে যেখানে পারে মড়া পোড়ায়। বাবলাতলায় একটু উঁচু জমি পেয়ে ওরা এখানেই কাজ সেরে নিচ্ছে।

নেতাই মাল খেয়ে চেঁচাচ্ছিল। স্যাঙাৎদের মধ্যে কে যেন চিতা থেকে চ্যালাকাঠ টেনে বিড়ি ধরিয়েছে, তাতে অপমান হয়েছে নেতাইয়ের। চেঁচিয়ে বলে—কোনো শালা চিতা থেকে বিড়ি ধরাবে না বলে দিচ্ছি। আমার ঠাকুরমার চিতা শালা, কারো বাপের নয়—বলে দিচ্ছি।

স্যাঙাৎদের একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—বিড়ি নয় রে, সিগারেট....

—কেন ধরাবে? ওর বাপের চিতা শা.....?

বলতে বলতে নেতাই বাবলাতলা থেকে উঠে খালের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে। আর বলে—আমার ঠাকুমার শালা পুণ্যি দেখ, চিতা নিভে যাবে ভয়ে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখেছিস কখনো অমনধারা শালা? বিড়ি ধরাচ্ছিস চিতা থেকে। আমার ঠাকুমার সম্মান নেই?

স্যাঙাৎরা খি-খি করে হাসছে।

নিশিকান্ত দেখে, নেতাইয়ের ঠাকুমার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এখনো সেখানে আগুনটা পৌঁছায়নি। চোখের পাতায় চন্দন, তাতে তুলসীপাতা সাঁটা। পোড়ার সময়টায় মানুষের কেমন লাগে তা বড় জানতে ইচ্ছে করে নিশিকান্তর। দু কদম এগিয়ে এসে সে ছাতা আর বোতল হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কেউ কিছু বলে না। সব ব্যাটা বোতল টেনে যাচ্ছে। বেসামাল।

আর হঠাৎ যেন কেউ দেখছে না দেখে, ফাঁক বুঝে নেতাইয়ের ঠাক্‌মা টক করে চোখ চাইল। নিশিকান্তর কিছু মনে থাকে না। বড় বিস্মরণ। কিন্তু নেতাইয়ের ঠাকুমা চোখ খুলে ভালমানুষের মতো তার দিকে তাকাতেই নিশিকান্তর ঝড়াক করে মনে পড়ে গেল, বহুকাল আগে, পেটব্যথায় বুড়ি কাতরাচ্ছিল এক ঘরে। তখন নিশিকান্ত বাবলার কচিপাতা থেঁতো করে রস খাইয়ে সারিয়েছিল ব্যথা। সেই বাবলা গাছের তলায় নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে, আর চিতার আগুনের মধ্যে আধপোড়া নেতাইয়ের ঠাকুমা। চোখে চোখ পড়তেই যেন বলে ওঠে, কী বাবা, মনে পড়ে?

মনে পড়ে? মনে পড়ে? বাদলা কেটে মনের মধ্যে একটা জোছনা যেন ভেসে ওঠে

হঠাৎ। পড়ে বই কি! কত কী মনে পড়তে থাকে হঠাৎ। নিশিকান্ত টের পায় মনে পড়ার বেনো জল হঠাৎ বাঁধ ফাটিয়ে ধেয়ে আসে যে! নিশিকান্ত ছাতাটা সাপটে ধরে বোতল চেপে ধরে বুকে। একটা 'আঁক' চিৎকার পেড়ে আবার খালধারের রাস্তায় উঠে আসে।

কিন্তু তবু মনে পড়া কি ছাড়ে। আকাশ থেকে হঠাৎ টাপুর-টুপুর খসে পড়ে অতীতের জল। পড়তেই থাকে। নেতাইয়ের স্যাঙাৎ দুপা এগিয়ে এসে তাকে ধরে—কি বাবা বোতলে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা নিশি!

—ছেড়ে দাও। বলে নিশিকান্ত একটা ঝটকা মারে। আর ওই ঝটকাতেই টর্চ বাতির আলোর মতো তার বর্তমানটা ছিটকে যায়। বাদলা দিনে ছোট পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আদিগন্ত দেখা যায়। মনে পড়ে। মনে পড়ে।

তার নাম নিশিকান্ত নয়। সে নয় এদেশের লোক। নীলকুঠির ধারে একটা ছোট কুঠিবাড়ি ছিল তাদের। মা ছিল মনোরমা, বাবা চন্দ্রনাথ। সুখের ছিল সংসার। জায়গাটা কী যেন! কী যেন! মনে পড়ে, বেঁটে লিচুগাছের বন ছিল সেখানে, থোকা থোকা ফল ধরত, পাকা সড়কের ওপর ছিল ইস্কুল বাড়ি, তার ঘন্টা বাজত ঢং ঢং, নিশিকান্তকে ডাকত। ...মনে পড়ে, মনে পড়ে—

কিন্তু কী যেন যন্ত্রণার ঝড় ওঠে বুকের মধ্যে! হাহাকারে ভরা এক বাতাস বয়ে যায়। কী হয়েছিল তারপর? অতীতের বৃষ্টি মাতালের মতো টলে টলে পড়ে, দোল খায়। মারদাঙ্গা আগুন কী সব হয়েছিল, দাড়িওলা, কালি-মাখা, মশাল-হাতে কিছু লোক....তারা পায়খানার তলায় নোংরায় লুকিয়ে কাঁপছে! মনে পড়ে....রেল লাইন, ইস্টিশান....লঙ্গরখানা...

নিশিকান্ত চিৎকার করে পিছলে পড়ে যায়। রাস্তা বেভুল। কোথায় যাচ্ছে সে? কার কাছে? জোছনায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে চারধারে চায় নিশিকান্ত। এ সে কোথায়?

মাঠের মাঝখানে ছাতা আর বোতল হাতে সে দাঁড়িয়ে আকাশ-জোড়া পৃথিবীটা দেখে। কী প্রকাণ্ড! সে একা! হারিয়ে গেছে!

ভূতুড়ে জোছনার হাহাকার চারদিকে। তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, কেউ নেই।

—আঁ—আঁ—আঁ বাক্যহারা চিৎকার দিতে থাকে নিশিকান্ত। চোখে জল আসে। সে উপুড় হয়ে পড়ে মাঠের কাদায় জলে। কোমর সমান ডুবে যায়। মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও.....

ঠিক এই সময়ে একটা সুতো কে যে গুটিয়ে নেয় লাটাইয়ে, হাত্তা মারে। টান লাগে। ঘুড়ি টাল খায়। বউমণি বুঝি ডাকে—নিশি-ই....

—যাই। বলে কাদাজল থেকে ওঠে নিশিকান্ত। ছাতাটা আর বোতলটা চেপে ধরে বুকে। পিরানের হাতায় চোখ মুছে নেয়। ঘুড়ির সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে বউমণি। বড় টান। চাকর বল চাকর, জন বল জন, টান একটা আছেই।

বেশ আছি বাবা, বেশ আছি। বিড়বিড় করে বলে নিশিকান্ত। পৃথিবীটা আবার বাদলা দিনের মতো ছোট হয়ে এসেছে। টর্চবাতির আলোর চৌহদ্দিতে বাঁধা জীবন। আগুপিছু আর কিছুই দেখা যায় না। এই বেশ আছে নিশিকান্ত। এবার নিশ্চিন্তে সে হাঁটে।

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রঙ ঘন নীল। পরনে একটা খাকী রঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু-চারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিকল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাতের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনো চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রং, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনো অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ঐ গাছতলায় বসে আছে। ঐখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ঐ চোখে ঘৃণা আক্রোশ, প্রতিশোধ—এই সব

কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ্য করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল, মাতাল আর ভূত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ্‌গিজ্‌ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাসমতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। পরপর এক গ্লাস ঠান্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাসমতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ লতাপাতা আঁকে। আর আঁকে খোঁপাসুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিমপাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল—স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ঐ এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ঐ সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন তখন দেখবে। সময়মতো স্নান খাওয়া, সময়মতো সব কিছু। এই সব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই

রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কি করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ঐ বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ্য করছে ও। ভয় করলে কি চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ঐ ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ঐ একবার। তাও জোর করে। এখন ঐ নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেল ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ঐ গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ-বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম...টেলিগ্রাম....! তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে! অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগড়ায়। চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা জানালা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল—ওকে কিছু খেতে দিও। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিও। ও তো কোনো ক্ষতি করছে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন!

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দুবেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গ্রোগাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীল মাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। এ ধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুল কুল করে তার মাথার ভিতর বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত—আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত নিয়ে গিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা! কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজ কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গত বছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের জুনিয়র থেকে। এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দেখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায় আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এঘর-ওঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে! কোনো কোনোদিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোনো কোনো দিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে! দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং টং করে ছুড়ে মারছে! ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঐ তুচ্ছ শব্দটি—ঘন্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইঁট কাঠ পাথরের স্তূপ! ঘন্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ঐ শব্দ যেন কখনো শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতকগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙক্ষা জাগে—ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কীসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়— কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙক্ষায় তার মন মুষড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনো পাথর ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই এক-ঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনো কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা

বাড়ির কাঠামো—লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবনে।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরানো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কি একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরানো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামী সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরোনো বাড়ির তিন তলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—এখনো নিনি আছে কি এখানে? আছে তো!

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনো আছে কি না সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে।

চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচ বছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছ। বুড়ো হওনি?

—আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছ কি না! তোমার স্বামী পুত্র হয়নি তো! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখনো সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গীটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের তীব্র ইচ্ছাটা এখনো অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে! সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামী মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ঐ যে গোপনতার ভান করে দামী বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতায় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল

ঝরে পড়ে। অবিকল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচ্ছে।

পুরোনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনো নির্জন সেক্সপিয়ার সরণি, কখনো চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনো মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে, এখানে নয় এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে। ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা হয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভূতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সবকি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়ছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারি বিরক্ত হয়ে তুষার—কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না? আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক রাত হল আরো। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুলগাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়।

সে ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিগ্যেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেবো। রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ঐখানে, ঐ ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনো মাছির মতো বসে থাকে— দেখ না? এখনো আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনো তেমনি উজ্জ্বল রং। চেয়ে দেখে না অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল! পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনো গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বীমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কীসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্যে ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো তো?

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু। আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়! প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কীসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো, তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার! অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে। চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চার ধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে! করা হল না! এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুলগাছ। তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট্-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে

বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাকে খোঁপাসুদ্ধ একটা মেয়ের মুখ, নিচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিন্ত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্র বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিং শিলঙও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—না নাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—নানাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন! কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপীয়ার সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোর চালাও ভাই। আরো জোরে—আরো জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে! যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু'বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারো জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন?

—বলি, ঐ রকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার! ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—নানাঃ। চমকায়! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনো মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে! জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতায় শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুল গাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনোদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল!

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্ ঠিন্ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কি বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসীদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকী প্যান্টের রং পাল্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনো অকৃপণ, সুন্দর, সুগন্ধ বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে

পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নিচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ আমার ঘরদোর। ঐ যে মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ঐ ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরো কত কী—

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না।

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ। থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার!

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্যলগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ? বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে? ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরোনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী! পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনো! কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে

তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ঐ যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী। বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে! অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে উঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে! ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়, নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বসে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি বিস্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, এবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু

"This is the way the world ends
Not with a bang, but a whimper."

একদিন, জুন মাসের এক বিকেলে মাখনলালের মন ভাল ছিল না!

সেদিন অফিসে অনেকক্ষণ ধরে একটানা একটা জরুরি কাজ করতে হয়েছে। যখন অবশেষে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে সে ঘড়ি দেখল তখন ছটা বেজে সতেরো মিনিট। তার মেরুদন্ড ব্যথা করছিল, মাথার ভিতরে কোথায় একটা রগ বিদ্যুতের মতো চমকে চমকে উঠছে। পাখার হাওয়ায় কোথায় একটা কাগজ উড়ছে—মাখনলাল দেখতে পেল না—কিন্তু সেই শব্দে তার শিরা-উপশিরা শিউরে উঠেছিল। তার চারদিকে জনশূন্য নিঃশব্দ ঘরটা প্রকাণ্ড হয়ে আছে। মনে হল তাকে অন্যমনস্ক রেখে সারা বিকেল ধরে জ্বর এসেছে।

করিডোরে বেরিয়ে এসে সে দারোয়ান রামজীবনের পায়ের শব্দ পায়। নাগরা জুতো অন্ধকারে হাতুড়ির মতো ঠুকতে ঠুকতে সে অনেকক্ষণ ধরে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছিল। চাবির গোছার শব্দ, কাশির শব্দ, দেহাতি গানের কলি পরস্পর মিশে যায়। সে এই বুড়ো অফিস বাড়িটার সিল করবার গালার অদ্ভুত গন্ধ, পুরোনো গঁদ, কাঠ আর বার্নিশের গন্ধ পায়। অল্প অন্ধকার, দীর্ঘ করিডোরটা পায়ে পায়ে পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয় বয়স ঢের বেড়ে গেছে। আর মনে হয় বাইরে কোথায় তাকে বাদ দিয়ে একটা উৎসব চলতে চলতে শেষ হয়ে এল। সিঁড়ি ভেঙে সে বাইরের আলো আর শব্দের মাঝখানে নেমে আসতে আসতে স্পষ্ট টের পেল রামজীবনের গানের কলি হঠাৎ লক্ষ্যহীন অন্ধের মতো টাল খেতে খেতে পুরোনো অফিস বাড়িটার কড়ি বরগা আর দেয়ালের পলেস্তারার ভিতরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাইরে হাওয়ায় দোকানের উজ্জ্বল আলো আর লোকজনের ভিড়ের ভিতরে নেমে এসে হঠাৎ ঘুম এবং স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়, তার তেমনি সবকিছু খুব অচেনা লাগছিল। মনে পড়ল সে অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি, জল খায়নি, কোনো খাবার খায়নি। অন্যদিন এই সময়ে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। মনে হয় ললিতা তার অপেক্ষায় আছে, কিন্তু আজ এক্ষুনি তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। মনে পড়ে কতকাল সে কলকাতার রাস্তায়, ময়দানে, এসপ্ল্যানেডে ঘুরে বেড়ায়নি, দোকানের শো-কেসে সাজানো জিনিস, আলো, লোকজন দেখতে দেখতে দু'পয়সার বাদাম শেষ করে খামোকা কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েনি। এইসব—খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল সে। তারপর আস্তে আস্তে ট্রাম রাস্তা পেরোলো মাখনলাল।

জুন মাসে পরপর কয়েকদিন অনাবৃষ্টি গেছে। জরাগ্রস্ত ফুটপাথ থেকে, দেয়ালের

গা থেকে ভাব উঠে আসছে। ধুলোয় ঘুলিয়ে উঠছে এসপ্ল্যানেডের আলো, গা ঘেঁষে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মন্থর ট্রাম চলে যায়। নিচু বুকচাপা দোকানঘর থেকে চামড়ার কটু গন্ধ। বুক গুলিয়ে ওঠে। বৃষ্টি হবে কি? মাখনলাল চোখ তুলে লাল আকাশ দেখল। মেঘ না, তারা না,—কিছুই দেখা যায় না।

আলো অন্ধকার, অবয়ব, চোরাগলি, নৃমুণ্ডের সারি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। শো-কেসে সাজানো রেডিও, গল্‌ফ্ স্টিক্, হাওয়াই শার্ট। স্যুট পরা 'ডামি' আলোর নিচে চকিতে হেসে উঠল। একটা সিনেমা হল। লবিতে নিঃসঙ্গ সাদা একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্র। মাখনলাল পেরিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে কী ভেবে দাঁড়িয়ে ফিরে এল। এখন বিকেলের শো চলছে। লবিটা নির্জন। মাখনলাল ওজন নেওয়ার যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল।

ওজন নেওয়ার যন্ত্রের ভিতর পয়সাটা ফেলে দেওয়ার পর....যখন ঠিন্‌ঠিন্ করে একটা জটিল গলিঘুঁজির পথ দিয়ে সেটা নেমে যাচ্ছিল তখন মাখনলাল যন্ত্রটাকে লক্ষ্য করল। পয়সাটা কোথায় ধাক্কা দিল কে জানে—হঠাৎ ভিতরে কোথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিউরে লাফিয়ে উঠল যন্ত্রটার হৃৎপিণ্ড। কোথায় একটা স্প্রিং শিরার মতো টিক্‌টিক্ করে কাঁপতে থাকে। লিভারের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে যে যন্ত্রটার জেগে-ওঠা টের পেল। মনে হয় এতক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর যন্ত্রটার শিরা ধমনীর ভেতর দিয়ে রক্তস্রোত প্রবলভাবে বয়ে যাচ্ছে।

টিক্ করে টিকিট পড়ল ছোট্ট খোপের মধ্যে।

কয়েক পলক মাখনলাল সাদা মসৃণ সুন্দর যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠান্ডা ঘুমন্তের মতো। মনে হয়, একটুক্ষণের জন্য জেগে উঠে, তারপর জাগরণ ক্লান্তিকর দেখে যন্ত্রটা আস্তে আস্তে আবার তার শীতল চিন্তাহীন ঘুম এবং স্বপ্নের ভিতরে চলে গেছে।

মাখনলাল ওজনের টিকিট তুলে একটা মেয়ের ছবি দেখতে পেল। ছবির নিচে তার ভাগ্য দেওয়া আছে। ওজন ছাপানো টিকিট হাতে মাখনলাল সিনেমা হলের লবি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

টিকিটের ওজন ছাপানো দিকটায় ভাল খবর প্রায়ই থাকে না। সে দেখল, এবার পাঁচ পাউন্ড কম! লম্বার অনুপাতে তার ওজন বরাবরই চার-পাঁচ পাউন্ড কম ছিল। তাহলে সবসুদ্ধ—মাখনলাল হিসেব করে দেখল, তার যতটা ওজন হওয়া উচিত—তার চেয়ে এখন তার ওজন আট-নয় পাউন্ড কম।

তার মন আস্তে আস্তে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ওজন নিয়ে সে কখনো বড়ো একটা ভাবেনি। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে টের পেল চারদিকে ভ্রাম্যমাণ লোকজনদের যাতায়াত, স্টেটবাসের শব্দ—এইসব আলোকিত দৃশ্যের ভিতরে থেকেও সে আজ কেবলই নিজের ওজনের কথা ভাবছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ হাঁটল মাখনলাল। তারপর রাস্তার ওপাশে একটা খুব ঝলমলে সিগারেটের দোকান দেখতে পেয়ে ট্রামরাস্তা পেরোলো।

ব্যস্ত দোকানীর দিকে পয়সা বাড়িয়ে 'এক প্যাকেট চারমিনার', বলে সে দোকানের অসম্ভব সরু লম্বা আয়নায় হঠাৎ নিজের মুখ এবং কোমর পর্যন্ত দেখতে পেয়ে চমকে

উঠল। নিজের লাবণ্যহীন দুর্বল মুখের দৈনন্দিন বিষণ্ণতা আর অবসাদ সে দেখে নিল। সে জানে তার শরীরও ছোটোখাটো—কোনোখানেই তা শক্ত কিংবা পুরুষালি নয়। অনেকদিন ধরে সে রক্তহীনতা রোগে ভুগছে কি? কিংবা বহুদিন ধরে অন্যমনস্কতার সুযোগে তার কোনো গোপন অসুখ তৈরি হয়ে গেছে! সে বুঝল না।

সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে দোকানী তাকে লক্ষ্য করছে টের পেয়ে মাখনলাল চোখ সরিয়ে নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়! ওজন নেওয়ার টিকিটটা তখনো হাতে ধরা ছিল। সেটা ছুড়ে দেওয়ার আগে মাখনলাল তার ভাগ্যটা পড়ল, যার অর্থ দাঁড়ায় "শীগগিরই আপনি খুব বিপদে পড়বেন, তবে সেটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না।" বিপদ! মাখনলাল ভ্রূ কোঁচকাল। আবছা রহস্যময় একটা কার্যকারণসূত্রকে সে টের পাচ্ছিল। সে জানে কোনো যুক্তির সূত্রে লেখাটা তার হাতে আসেনি—এর কোনো মানে নেই। তবু কোথায় সূক্ষ্মভাবে সে সচেতন হয়ে উঠছিল। সিগারেটের তীব্র ধোঁয়া তার স্নায়ুপুঞ্জে, গলার স্বরনালীতে, বুকে দয়াহীন ছড়িয়ে পড়েছিল। সে টিকিটটা দুমড়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

তারপর রাস্তায় দোকানের উজ্জ্বল আলো, কাটা কাটা নাকমুখ চোখ গলির মুখে চোরা অন্ধকার দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ বোধহীনের মতো হাঁটল মাখনলাল। সে এসপ্ল্যানেডের বড় রাস্তা, চেনা পথ ছেড়ে আধো-অন্ধকার অচেনা রাস্তায় ধাঁধার ভিতর উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরছিল। কখনো মন খারাপ হয়ে যেতে থাকলে—সে দেখেছে কিছুই করার থাকে না। সে নিজের ভীষণ অন্যমনস্কতা টের পেল! তার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে, তেষ্টায় বুক জ্বলছে। অচেনা গলির মুখে ছিম্‌ছাম্ একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেয়ে তার দরজায় উঠে দাঁড়াল মাখনলাল। কাচের পাল্লা ঠেলে ভিতরে একটা পা বাড়াল।

ভিতরে কোথাও রেডিও কিংবা গ্রামোফোনে কোনো অদ্ভুত ড্রামের বাজনা দমকে দমকে বাজছে। পলকের জন্য তার মনে হল শব্দটা নেড়ি কুকুরের মতো গায়ে গা ঘষটাতে ঘষটাতে আর্ত চিৎকার করে তাকে এই ঘরে ঢুকতে বারণ করছে। ভিতরে ধুধু আলো জ্বলছে—সেই আলো কাঁচ বসানো টেবিল, ছাইদানি, পিরিচ, চেয়ার। টেবিলের চকচকে বার্নিশের ওপর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আলপিনের মতো তার চোখ বেঁধে। মনে হয় এই লম্বাটে হলঘরের মতো ঘরটার সবকিছুই আলো বিকিরণ করছে। ভিতরে খুব বেশি ভিড় নেই। যারা আছে তাদের প্রায় সকলকেই বিদেশি কিংবা জাহাজের লোক বলে মনে হয়। বাঁ দিকে দেয়ালের কাছে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—তার কালো মুখে বেশি পাউডার কিংবা রঙ মাখা বলে মুখটা ছাইরঙা—রক্তশূন্য। রুক্ষ চুল, উঁচু চোয়াল আর মভ রঙের শাড়িতে তাকে সাজানো ডামি মনে হয়। শিরাবহুল কালো একটা হাত কাউন্টারের ওপর প্রাণহীন—কেউ এসে তুলে নেবে বলে অপেক্ষা করছে।

দু'-একজন ফিরে তাকিয়ে মাখনলালকে দেখল। যারা বসে আছে তারা সবাই খুব লম্বা চাওড়া আর জোয়ান বলে তার বোধ হল। সে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা কতকগুলো মজবুত কব্জি দেখছিল। দমকে দমকে ছড়িয়ে যাওয়া গান, তালে তালে মৃদু মাথা নাড়া—সবকিছুই অতিরিক্ত এখানে। তাকে কেউ গ্রাহ্য করল না! যেন সে

তার তুচ্ছ শরীর, রক্তশূন্য মেয়েলি মুখ, দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এখানকার ভীষণ পুরুষালি একটা আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এইসব আলো, গান, মেয়ে তার জন্যে নয়। মনে হল—সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভাবল—ফিরে যাই।

কাউন্টারে বসা প্রকাণ্ড একটা লোক—হাতছানি দিয়ে সে মাখনলালকে একটা খালি টেবিল দেখিয়ে দেয়। অকারণে খুনখারাপি রঙের ঠোঁট ফাঁক করে মেয়েটা হাসে। চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল মাখনলাল। বমি হওয়ার আগের মুহূর্তের দমকা ঘূর্ণি শরীরের ভিতর থেকে উঠে আসছে টের পেয়ে মাখনলাল হাত নেড়ে লোকটাকে জানাতে চাইল—বসবে না। লোকটা মোটা একটা আঙুল মুখে পুরে মাড়ি পরিষ্কার করতে করতে তার দিকে নিস্পৃহ তাকিয়ে দেখে।

মাখনলাল নিজে কী করছে বুঝতে পারছিল না। বেরিয়ে আসবার জন্য সে অন্ধের মতো কাচের পাল্লাটার দিকে হাত বাড়াল। সেই মুহূর্তেই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো এক বেয়ারা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে বোঝে—তার জন্যেই। ফিরে তাকাতেই হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে তার মনে হল ভিতর থেকে কেউ আগুনের মতো একজোড়া চোখ তার দিকে ছুড়ে দিয়েই নামিয়ে নিল। পয়সার মতো কি একটা বস্তু তার শরীরের জটিল ফুসফুস মেরুদণ্ডের পথ বেয়ে ঠিন্‌ঠিন্ করে হঠাৎ গড়িয়ে গেল। উন্মাদ ড্রামের শব্দ সেই মুহূর্তেই খুব উঁচু গ্রাম থেকে হঠাৎ চূর্ণীকৃত ভগ্নাংশে লয় পেয়ে যাচ্ছিল। পলকের জন্য মাখনলাল নিজের জেগে-ওঠা টের পাচ্ছিল! কার চোখ সে দেখতে পেয়েছে—বুঝল না।

বিনীতভাবে পাগড়ির ছায়ায় মুখ ঢেকে বুড়ো বেয়ারাটা মাখনলালকে কিছু বলছিল। মাখনলাল শুনল না, কিংবা শুনেও কিছু বুঝল না। সে জানত না—যেন তার অজান্তেই কোনো ঘটনা এখানে ঘটে আছে। যেন এরা এতক্ষণ দোকান সাজিয়ে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে দ্রুতচোখে শেষবারের মতো রেস্টুরেন্টের ভিতরটা দেখে নিচ্ছিল। মনে হল, এখন কোথাও কোনো জরুরি জিনিস সে ফেলে যাচ্ছে। ভিতরের আলো, সহস্র তল থেকে প্রতিধ্বনিত বাজনার শব্দ, তালে তালে মৃদু মাথা নাড়ার ভিতরে কোথায় যেন যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সৈনিকদের মতো বে-পরোয়া ভাব ছিল! মেয়েটার স্থির অবয়ব কাউন্টারে হেলানো, প্রকাণ্ড লোকটা হঠাৎ ঘাড় হেলিয়ে সিলিঙ দেখছে, বুড়ো বেয়ারাটা দাদুর মতো স্নেহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এদের ভিতর কার চোখ সে দেখতে পেয়েছে বুঝল না। চোরা মারের মতো তাকে আঘাত করেই চোখটা বিবরে সরে গেছে। যেন কেউ আঙটি-পরা হাত আলোর সামনে এনেই সরিয়ে নিল—বিচ্ছুরিত আলো পলকের জন্য তার চোখে বিঁধেছিল।

কেন তার এমন মনে হল! কাচের পাল্লাটা ঠেলে, সিঁড়ি ভেঙে ফুটপাথে নেমে যেতে যেতে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তিকে টের পায় মাখনলাল। যেন হঠাৎ জেগে উঠে সে ঠিক কোথায় এসেছে—চারপাশে তাকিয়ে সে বুঝবার চেষ্টা করল। শ্বাস নিতে তার সামান্য কষ্ট হচ্ছিল—খুব উত্তেজনার পর যেমন হয়। সে স্থিরভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকাতে পারছিল না, বুঝতে পারল না কোথায় এসেছে। যেন তার হাত-পা কোনো কিছুই তার বশে নেই। কেন সে এখানে এসেছিল! চকিতে তার মনে পড়ে যায়, অন্যদিন এতক্ষণে সে তার শহরতলির ছোট্ট বাসায় ফিরে গেছে। আর দেরি দেখে নিশ্চিত ললিতা এখন

ছয় বছরের বুকুকে পাশে নিয়ে মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। সে ফিরলে উঠে দরজা খুলে দিতে ললিতার ঘুমন্ত মুখবেয়ে পড়া চুল, স্খলিত আঁচল দেখা যাবে।

খানিকক্ষণ—যেন ঘুমের ভিতরে—হেঁটে গেল মাখনলাল! কিছুক্ষণ আগেকার গুমোট ভাবটা আর নেই। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে—মনে হয়। অবাস্তব এসপ্ল্যানেড দুলে দুলে সরে যায়। ভেঙে-পড়া দুর্গের অবশিষ্ট একটিমাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেন্ট! কারা তার সঙ্গে হাঁটছে, উল্টোমুখো হাঁটছে, সামনে পিছনে এলোপাথাড়ি তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের অবয়ব, মুখ এবং শো-কেসে, আয়নায় প্রতিবিম্বিত তাদের গোলাকার, কখনো লম্বাটে অ্যাবস্ট্রাক্ট চলন্ত ভগ্ন অবশেষ! কেন এমন হয়—সে ভাবছিল। কার চোখ সে দেখেছিল! কার চোখ! খুব নিষ্ঠুর কেউ কি! অমন নিষ্ঠুর চোখের লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভাল। কেমন নিঃসঙ্গ লাগছিল মাখনলালের। বুকে লুকানো কোনো মাইক্রোফোন থেকে কে যেন কেবলই কথা বলছে। তার ঠোঁট নড়ছিল। সে কিছুই শুনতে পেল না। বুঝল না। হাজার কোণ থেকে, স্মৃতি থেকে, স্বপ্ন থেকে তির্যক, ভাঙা যৌগিক দৃশ্য ও শব্দ তার ওপর ঝরে পড়ছিল।

নাকি—বৃষ্টি! সুরেন ব্যানার্জি রোড পার হতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিসের উত্তোলিত হাতে বাধা পেয়ে সে জুন মাসের প্রথম বৃষ্টিপাত দেখল। হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাতে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।

সংবিৎ পেয়ে দৌড়ে শিয়ালদার বাসে উঠতে গিয়ে সে দেখল ডবল-ডেকারে বেজায় ভিড়। বাস-স্টপেজের শেড-এর নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল মাখনলাল। শেড-এর তলায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছিল। ভিড়ে দাঁড়িয়ে সকলের গায়ের গরম অসুস্থ ভাপ, নিশ্বাস, সিগারেটের ধোঁয়ার শ্বাস নিতে নিতে সে দূরগামী হরিণের লঘু পদশব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মনে হয় চারপাশের সবকিছু হঠাৎ কোথায় যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। সিঁড়িতে, ফুটপাথে, রাস্তায়, ডবল-ডেকারে—সবকিছুর ওপর চরাচর জুড়ে প্রবল হরিণের মতো লাফিয়ে ছুটছে বৃষ্টি। রাস্তার চৌ-মাথা, পুলিস, লম্বা অফিস-বাড়ি, উজ্জ্বল দোকান—সব কেমন আড়ালের মতো স্থির থেকে ভিজে যাচ্ছে।

বৃষ্টির প্রথম দমকটা কেটে গেলে মাখনলাল ঘড়ি ঢেকে কব্জিতে রুমাল বেঁধে রাস্তায় নামল। কিছুটা হেঁটে গেলে আবার বৃষ্টির জোর বাড়তে থাকে। জলের ফোঁটার প্রবল আঘাতে তার মুখের চামড়া ফেটে যাচ্ছিল। মাথাটা ভিজে যাচ্ছে—চুল বেয়ে জল-ভেজা ঘাড়ের কাছ দিয়ে অজস্র আঁকাবাঁকা কেঁচোর মতো পিঠ বেয়ে নামছিল। হাঁটার তালে কিংবা বাতাসে হঠাৎ জামাটা পিঠের চামড়ার ওপর থেকে সরে যাচ্ছিল বলে তার বোধ হচ্ছিল কেউ তার চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

রাস্তাটা ধুধু করা বাষ্পাকার জলকণায় আদি অন্তহীন। একটা স্কুটার তীব্রভাবে জল কেটে লঞ্চের মতো চলে যায়। সামনে পা ফাঁক করে বলিষ্ঠ একটি ছেলে লোহার হাতে হ্যান্ডেল ধরে আছে। পিছনের সীট্-এ জড়োসড়ো রুমালে ঢাকা মুখ মেয়েটি ছেলেটির পিঠে এলিয়ে আছে। সামনে পিছনে ছায়ার মতো কয়েকজন কোলকুঁজো হয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। স্কুটারটা বৃষ্টির ভিতরে দূরে চলে যেতে যেতে হঠাৎ বাঁক নিল, লাফিয়ে উঠে টাল খেয়ে তিরের মতন মিলিয়ে গেল। উল্টে পড়ল না—আশ্চর্য! মাখনলাল দেখল।

চারিদিকে এখন এই বৃষ্টি ছাড়া কিছু নেই। রাস্তার দুধারে সে প্রকাণ্ড উঁচু বাড়িগুলোর তলায় দাঁড়ালে নিজেকে ভীষণ হীন বলে মনে হয়, যে-বাড়িগুলো এখন ঝাপসা—পটে-আঁকা—নিসর্গের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া ঝুপসি ঝুপসি গাছের মতো দাঁড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে ভিজছে। নিঃসঙ্গ একা মাখনলাল বৃষ্টির ভিতরে হেঁটে যেতে যেতে টের পেল চারধারে এই বৃষ্টি এক প্রবল ঘেরাটোপের মতো ঘিরে আসছে— ঝাপসা ধোঁয়াটে পুরোনো ছবির মতো ঘর-বাড়ি দোকান, দু-একটা মানুষ—এরা সব অ-সত্য।

কোথায় যেন এই বৃষ্টির সঙ্গে সে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। চেনা রাস্তা, তবু তার মনে হল কোনোদিন কখনো সে এই রাস্তায় আসেনি। এই বৃষ্টি যেন তার চেনা-পরিচয়কে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যেন সে এক অদ্ভুত পর্দার আড়ালে আছে, পর্দা সরালেই দেখতে পাবে—বিদেশ। স্রোতের মতো জল ফুটপাথ থেকে তার জুতোয় চলকে উঠে বয়ে যাচ্ছে। সে খেয়াল করল না।

এমন বৃষ্টির মতো স্বাস্থ্যকর আর কী আছে! মনে পড়ে কতদিন সে বৃষ্টিতে ভেজেনি, রোদে আপাদমস্তক পোড়েনি। মনে হয় প্রেমহীন প্রকৃতিহীন কতগুলি দিন সে স্বপ্নের ভিতর কাটিয়ে দিয়েছে। কখনো ফিরেও দেখেনি দিনগুলি। কোনো স্মৃতি থাক তাও চায়নি। মনে হয় বহু দৃশ্য, শব্দ, চলার ভঙ্গি, অনেক নিস্তব্ধতা, মৃত্যুশোক এইভাবে তাকেই উদ্দেশ করে ঝরে গেছে।

দূরের চিৎকার, অস্পষ্ট মন্থর ট্রামের শব্দ, পাখির ডানার শব্দ, পাতা ঝরে পড়বার শব্দ তার উদ্দেশে কেউ নিক্ষেপ করছিল। এমন স্বজনহীন, বান্ধবহীন সন্ধেবেলা সে আর দেখেনি। কেন সে বৃষ্টিতে এল? কেন? মনে হয় এমনতরো সাধ তার কিছু কিছু রয়ে গেছে। মনে পড়ে কোনো শীতের দুপুরে কার্জন পার্কে গাছের ছায়ায় সারাদিন শুয়ে থাকবার সাধ তার কখনো মেটেনি। মানুষের কাছে নয়—কিন্তু অন্য কোথায় যেন সে ফিরে যেতে চেয়েছিল। পুব বাংলায়—তাদের পুরোনো বাড়ির জানালার ধারে এতদিনে শেফালি ফুলগুলি ম্লান হয়ে এল। পানা পুকুরের কালো পাড়ে শ্যাওলা—কচুপাতায় বাতাস লাগবার শব্দ—কামরাঙা গাছ থেকে একটিমাত্র ঘুঘুর ডাকে কত গভীর দুপুর হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেল।

কার চোখ সে দেখেছিল! সে কি খুব অচেনা কেউ? নিজেকে এমনতরো উদ্বাস্তু তার আগে কখনো মনে হয়নি। ছেলেবেলায় ঘরের দেয়াল-ঘড়িটার শব্দ সে যেমন সবসময়ে খেয়াল করে শুনত না—কিন্তু ঘর নির্জন হয়ে এলে কিংবা মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তার দম শেষ করে দেওয়ার অদ্ভুত একরোখা শব্দ শুনে চমকে উঠে ভেবেছে 'আরে—ঘড়িটা! তাই না!' তেমনি হঠাৎ নির্জন নিঃশব্দ হয়ে গিয়ে সে তার যন্ত্রটাকে টের পেল। বিষণ্ণতার ভিতর দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আটটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরল মাখনলাল।

বৃষ্টি পড়ছে না। বাইরে জুন মাসের আকাশ খোলা হয়ে আছে। মেঘ না, তারা না—কিছুই দেখা যায় না। ট্রেনের জানালার হাওয়ায় মাথা রেখে চোখ চেয়ে ছিল মাখনলাল। ভেজা মাথা বুক ঠান্ডা বাতাসে চিড় খেয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের চাকা দ্রুত লাইন বদল করছিল। জং-ধরা লোহালক্কড়ের শব্দ, কাপ্‌লিঙের শব্দ, স্প্রিং আর ঢিলেঢালা নাটবল্টুর শব্দ, অবিরাম তার শরীরের ভিতর থেকে উঠে আসতে থাকে। উল্টো-মুখো

ট্রেনের ভৌতিক জানালায় কার হাত সাপের মতন হয়ে যায়। কার চশমার কাচে বাইরের অন্ধকার নিসর্গে বিকৃত দোমড়ানো প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

একটু রাতে তার শহরতলির ছোট্ট বাসায় ফিরল সে। দরজা খুলে দিতে দিতে ললিতা অস্পষ্ট—যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে কথা বলছিল। চকিতে মাখনলাল তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওপাশের দেয়ালের ক্যালেন্ডারের দূর সূর্যাস্তের দিকে বহমান তিনটে নৌকোর ছবি দেখতে পায়। মেঝের ওপর বুকু ঘুমোচ্ছে! অচেনা মিশ্র এক জনতার ভিতর থেকে এসে ঘরের দরজায় পা দিয়ে সে নিজেকে আলাদা অনুভব করছিল।

হাতমুখ ধুয়ে ঢাকা ভাত খেয়ে নিতে নিতে আস্তে আস্তে সে স্বাভাবিক বোধ করছিল। ললিতা খেতে বসলে দু-একটা কথা বলছিল মাখনলাল তারপর কী বলছিল—ভুলে গেল।

খাটের ওপর আলাদা বিছানায় শুয়ে মাখনলাল দেখছিল মেঝেতে ছোট্ট বিছানায় বুকুর পাশে শুয়ে পড়বার আগে ললিতা টর্চ জ্বেলে মশারির ভিতরে মশা খুঁজছে। মনে পড়ে কবে কোনো ভিড়ের ট্রামে কিংবা বাস-এ কার হাতের চামড়ায় সবুজ উল্কিতে আঁকা একটা ন্যাংটো পরীর ছবি দেখেছিল। পিঠে কাকের পাখার মতো দুটো পাখা লাগানো। বয়সে হাতটার চামড়া কুঁচকে এসেছিল—পরীটার শরীর হয়েছিল বেঢপ—এবড়ো-খেবড়ো—নাক-মুখ-চোখ কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয়েছিল—হাতের ওপর পরীটার বয়স অনেক হয়ে গেল—তবু হাত ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা!

ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মাখনলাল চোখ বুজবার আগে ললিতাকে উদ্দেশ করে বলল, "বুঝলে, ছুটি পেলে খুব দূরে কোথাও বেড়াতে যাব।"

অনেক রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল মাখনলালের। কিছুক্ষণ সে কোথায় কীভাবে আছে না বুঝে চেয়ে রইল। মাথার ভিতরে একটা স্কুটারের শব্দ ঘুরে ঘুরে যায়। সে টের পেল তার হাত, পা, মাথা—সব অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছড়ানো—চিত হয়ে শোয়া, দুটো হাত বুকের ওপর। কারা যেন চোরাগলিতে পরিত্যক্ত নির্জনে একটা ম্যান্‌হোলের ঢাকনা খুলে রেখে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে গলিজোড়া সেই হাঁ-করা ম্যান্‌হোলের দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ মাধ্যাকর্ষণের কোনো এক মুখ দিয়ে শূন্যতা এবং সময়হীনতার মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল? কিন্তু খুব বেঁচে গেছে মাখনলাল। ঠিক সময়ে ঘুম না ভাঙলে সেই গর্তে—অন্ধকারে—পূতিগন্ধে নগণ্য ইঁদুরের মতো মৃত্যু হত।

অস্থিরতা টের পেয়ে মাখনলাল উঠে বসল। স্খলিত অচেনা গলায় ডাকল—"ললিতা!" কেউ উত্তর দিল না। কারো জেগে থাকবার শব্দ তার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বাইরে বৃষ্টিপাত থেমে গেছে। কিন্তু কোথায় যেন বৃষ্টির সঞ্চিত জল চুঁইয়ে কোনো শূন্য টিনের কৌটোর ওপর পড়ছিল। প্রতিটি ফোঁটার সেই ভারযুক্ত শব্দকে কে যেন তার উদ্দেশে শব্দভেদী বাণের মতো নিক্ষেপ করছিল।

অনেকক্ষণ ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানে এক অদ্ভুত নিশ্চেষ্টতার ভিতরে সে বসে রইল। বুকের বাঁ পাশে একটা অস্পষ্ট ব্যথা ডাক-টিকিটের মতো লেগে আছে। মনে হল স্বপ্নগুলো এখনো তার মাথা থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়নি। কোথাও খুব কাছাকাছি তারা অপেক্ষা করে আছে। সুযোগ পেলেই স্বপ্নের ভিতরে—ঢাকনা খুলে রাখা ম্যান্‌হোলে টেনে নিয়ে যাবে। এক ঝলক নীল বিদ্যুতের আলোয় ঘরটা অস্পষ্টভাবে

তার চোখের সামনে লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে? সঞ্চিত জলের সেই প্রতিটি ফোঁটার জ্যা-মুক্ত শব্দ, শূন্য-টিনের ক্যান—নির্জনতা তাকে অন্ধকারে স্বপ্নের ভিতরে ঠেলে দিচ্ছিল। সে টের পেল তার সারা শরীরে শাঁসওয়ালা ব্রণের মতো শিউরানো রোমকূপ খাড়া হয়ে গেছে।

চৌকির পাশেই রাখা টুলের ওপর থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে অনেকটা জল খেল মাখনলাল। তারপর সিগারেট ধরাল। বৃষ্টির পর গুমোট গরমে ঘরটা ফেঁপে আছে। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুক এখনো ভার। অস্পষ্টভাবে তার মনে হচ্ছিল, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই ললিতাকে ডাকা উচিত। কিন্তু অতটা সময় পেল না মাখনলাল। ঘুম তটভূমি অতিক্রম করে তার জাগরণের ভিতরে আছড়ে পড়ছিল। কে যেন তাকে ধীরে টেনে নিচ্ছিল ঘুম স্বপ্নের ভিতরে! স্কুটারের শব্দটা প্রচণ্ড বেগে তার মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে। চকিত মাখনলালের মনে হয় কে যেন বরাবর তার আগে আগে হেঁটে এসেছে। ওজন যন্ত্রের ভিতর ঠিক টিকিটটা তার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল কে? অচেনা রেস্টুরেন্টে এক মুহূর্তের জন্য মুখোশ খুলে তার ভিতরের আগুন মাখনলালকে দেখতে দিয়েছিল কে? উত্তল কাচে তির্যক বিম্বের মতো চকিতে বিদ্যুতের আলোয় ঘরটা আবার লাফিয়ে উঠলে মাখনলাল দেখতে পায়—সে। সাদা দেওয়ালের মতো বুক—সাদা দেওয়ালটাই। ঈশ্বরের বুকের মতো সাদা দেওয়ালটায় চকিতে আবার বিদ্যুৎ বিস্ফোরিত হলে সে—মাখনলাল— সেখানে নিখুঁত সুন্দর একটা বুলেটের ছ্যাঁদা দেখতে পায়। মুহূর্তেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে সাদা দেওয়াল অন্ধকার দিয়ে ক্ষতস্থান কামড়ে ধরল।

সিগারেটটা কোথায় ফেলল মাখনলাল! কোথায়....? সে প্রাণপণে উঠে বসবার জন্য চেষ্টা করতে করতে ললিতাকে ডাকতে চাইল। চেষ্টা করে দেখল মাখনলাল—ওঠা যায় না। পিয়ানোর রিড টিপে কে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলো ফেলছে। সে হাত বাড়িয়ে খুঁজছিল—সিগারেটটা। এই ঘরেই কোথাও কোন অন্ধকার কোণে সেটা পড়ে আছে....জ্বলছেও, তার পোড়া গন্ধ আগুনের তাপ সে অনুভব করল। সে নিশ্চিত বুঝল—কোথাও জড়ো করে রাখা কাপড়-চোপড়ে, কাঠের টেবিলের পায়ার সঙ্গে লেগে, কিংবা বিছানায় কারো অসতর্ক চুলের ভিতরে সিগারেটটা নির্দয় জ্বলছে।

"কেন এভাবে! কেন!" মাখনলাল প্রশ্ন করে। মনে হয় বহুকাল ধরে একটা অন্ধকার ঘরের ভিতরে কোথায় একটা সিগারেট জ্বলছে—সে খুঁজছে। খুঁজছে। সিগারেটটা আছে কোথায়—তার জ্বলা সে টের পাচ্ছিল। প্রাণপণে উঠবার, কাউকে ডাকবার জন্য সে ছটফট করছিল।

রাতের প্রথম কুকুরটা ডেকে উঠতেই আস্তে আস্তে হাল ছেড়ে দিল মাখনলাল। বুঝতে পারল—সে মারা যাচ্ছে। ইঁদুর আরশোলার মতো তুচ্ছভাবে। কার ক্ষতস্থান থেকে দু' ফোঁটা রক্ত দু'চোখে গড়িয়ে পড়ল ওজন যন্ত্রণা ট্রাফিক পুলিসের মতো হাত বাড়িয়ে তার হাতে একটা টিকিট তুলে দেয়। মাখনলাল কিছুই দেখতে পায় না। নিশ্চিত শেষ স্বপ্নের ঢেউটা এসে পড়লে সে চকিতে শুনতে পায় ললিতা তাকে ডাকছে।

কিন্তু তখন তটভূমি ছেড়ে দিয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে যাওয়ার মতো মাঝসমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিল মাখনলাল।

আমাকে দেখুন

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম, তারপর নীরেট জমাট ভিড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে যতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড় উঁচুতে—আমি বেঁটে মানুষ—অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিকে ধরে দাঁড়াই, তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারো গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দুধারে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ্য করছে না কেউ। এটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু লক্ষ্য করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি, তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনো ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি—টেকোমানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা—সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর—আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়ও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দু'ধারে উঁচু উঁচু মানুষ—এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না। কিংবা দেখলেও লক্ষ্য করছেন না—আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাব, সেই কারণেই কিছু নমস্কারী কাপড়-চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিগ্যেস করলাম, "নিউ মার্কেটে যাবে?" আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনো অর্থ হয় না, বরাবর আমার বাসার কাছে কাটরায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফস্বলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখেনি, আর দুই নম্বর কারণ হল আমার শ্বশুরবাড়ির

দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে, কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভ্রূ একটু ঊর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ঐ নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকান-পশার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে কোনো দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে চোখ রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে! আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরীর চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ্য না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পশারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলেছিল বটে, আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আছি কি না তা সে লক্ষ্য করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করা একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলোকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফস্বলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ্য করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আমি উঁকি মেরে দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হল ওর মুখ দেখে, তবু আর একটু খেলিয়ে ধরা দেবো বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ গলি সে গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে-চোখেই রাখছিলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে, এবার আমাকে না পেলে ও কেঁদেই ফেলবে—এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী! চোখ দুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উল্টোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! বিপরীত দিক থেকে ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হল আমাদের, এমন কী ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি—ও কি আমাকে দেখেনি। আবার আমি অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উল্টোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজনকে লক্ষ্য করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও,

এমন কী পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হল—কখনো বইয়ের দোকানের সামনে কখনো ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনোবারই চিনতে পারল না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে গেল। তখন আমি ভাবলাম মফস্বলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম—এই যে! ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে-টেখে তারপর ভীষণ জোরে শ্বাস ফেলে কেঁপে কেঁপে হেসে বলল—তুমি! তুমি! কোথায় ছিলে তুমি! আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি! আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময় ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ঐ লুকোচুরি খেলার সময়ে আমি বার বার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না, কিন্তু আমি বার বার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল—সত্যি! তাহলে তুমি আর কখনো লুকিও না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কন্ডাক্টর, এইখানেই আমি নেবে যাব—দেখি দাদা....দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে...ঐ দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কন্ডাক্টর বাস ছাড়ার ঘন্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশমাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ্য করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালই লাগছে। ঐ তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দেখ আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিস হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিস, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি হাতখানা ভেরে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটা বোধহয় একশো বছরের পুরোনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল্—ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট বয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছ'দিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটোটিই দেখেছিলে—যখন আমার বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ, যখন আমার ভাল করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী! যদি সত্যিই জিগ্যেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বলবে— আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনোকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল—সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

আমার চাকরি ব্যাঙ্কে। দোতলায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসেবেও আমি খুব পাকা। তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনো পেমেন্ট, কখনো রিসিভিংয়ে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওলা একটা ড্রয়ার। তার কোন্‌টায় কত টাকার নোট তার কোন্‌টায় কোন্ খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার....তারপর টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে....তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার—ইস্ লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করছে—কী একঘেয়ে! ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড় খদ্দের—প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশিরভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড় শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের বড় একটা রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু! একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড় একটা ভাবি না! অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয়নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন—কোথায় দেখেছি বলুন তো। মনেই পড়ছে না। তখন শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে, যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা—তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাঙ্কের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ-এ....সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জিন-এর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন—চিনেছি। কী জানেন, ঐ ঘুলঘুলি আর ঐ খাঁচার মধ্যে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়....বুঝলেন না! আসল কথা হল ঐ পারসপেকটিভ—ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ঐ খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন আপনি, তেমনি দেখুন এই কোট-প্যান্ট টাই আর টাক মাথা—এর মধ্য দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর আমি—আমাদের কোনো সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসেপকটিভের কথাই ভাবছিলাম! ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম রেলকলোনিতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ-মা বলে বাসায়

আদর ছিল না। আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে মাঝে বসত। জড়োসড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনো আমার কাঁদুনে ছোট বোনটাকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াত! মা আমাকে বলত—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভাল করে দেখতাম—আর কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা—আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে বলে ও আসে নি! রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করলাম—তারপর কী হল, সে কী মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন—না না মরবে কেন। তাকে আমি বিয়ে করেছি বড় হয়ে। সে এখনো আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে, বদমেজাজি, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই। সেই বেলী—যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে এক গাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল—সেই ভালবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ—সে মুখ বড় মায়ামমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালবাসায় আমার মন ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাব। বুঝলেন না....বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন—ঐ যে ঘুলঘুলিটা—যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল—ঐ ঘুলঘুলিটা....

এই যে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেন্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউন্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার কাছে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাঙ্কে। মাঝে-মধ্যে চোখে চোখ পড়লে আমি হেসে জিগ্যেস করি—কী, বাবা ভাল তো! ও খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলে—হ্যাঁ—। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনো লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় এ জায়গায়, তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাতটা। তখনো ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউন্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যি কখনো আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকটির কথা ভাবছে এখন, শিগগিরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপশনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দুখানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি যে, ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরে দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে নিচে যাব টিফিন করতে।

তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন অ্যারারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও।

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া—বলো কী? হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ঐ সুন্দর হলুদ রং, মসৃণ গা, প্রকাণ্ড চেহারা—মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দুদিন পর পর কলা খাই। দাও একটা। না, না ঐ একটাই—এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনো যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমনকী খুব কঠিন কোনো কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে—একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই—উনিশশো উনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু'হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রীক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষ'ও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে, আমাকে দেখুন; এই যে আমি—অরবিন্দ বসু—অরবিন্দ বসু—এই যে না-লম্বা, না-রোগা, না-ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রীক রো নই, ভারতবর্ষও নই—ঐ শব্দগুলোর সঙ্গে অরবিন্দ বসু—এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনো ধরতে পারবেন?

যাক্ গে সে সব কথা! মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাঙ্কের ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়, কেউ কেউ মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ঐভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না—আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে—আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে—কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়!

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম! উদাসীন মশাইরা, যদি এর ওপর কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন। কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে। দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে। হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভাল'। তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর

সালের ষোলোই জুলাই—আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হল। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোসা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি!

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন! আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা! ভাববেন না মশাই, ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোকা মানুষ ওতে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভাল যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর সম্ভব অন্যের মুখ—যেন যে কোনো জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি—আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাব বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ঐদিকে—না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা—অফ্‌সাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনো গোল হয়নি। আর ঐ ছেলেটা—হায় ঈশ্বর, কে ওকে ঐ লাল সোনালী জার্সি পরিয়েছে! ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিন তো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে! আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে! তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট—কী সাংঘাতিক! ওদিকে আর আট কি ন' মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে! ক্ষুদে টিমটার সব খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ঐ যে ছেলেটা— অফ্‌সাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল—আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি—এই আমাকে দেখ, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু, তুমি কি বোঝো সে সব? তুমি তো জানই না যে, আমি—এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন—কী রকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে। আমি কাঁদি কিংবা হাসি— কিংবা যাই করি—কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হল না। রেফারি ঐ লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কী রকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-

লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়ে দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোকা। তাতে কারো কিছু এসে যায় না। এই যে আমি সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত—ভাল করে ভাত খেতে পারিনি উত্তেজনায়—এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লীগ টেবিলে আপনার টিমের অবস্থান ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সাড়ে উনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোজে হেরে যাচ্ছে আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড় দেরি করছে। তাই, আমি—অরবিন্দ বসু, ব্যাঙ্কের ক্যাশ ক্লার্ক—আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ঐ যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোট ছেলেটা—হাপু। বড় দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে—রথের মেলায় যাব বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ঐ যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নিচে জ্বলজ্বল করছে দুখানা চোখ, আমি এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল— ওর মা ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে—হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু—উ—উ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়—কত দেরি করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই, বাইরে থেকে ফিরে এলে—এই আপনজনদের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর গরম গা। মুখে ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে দিচ্ছি যেন! বললাম—যাব বাবা, বড় খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল—শিগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড় মায়ায় বললাম—আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ! আসলে ওর ঐ নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড় ভাল লাগে আমার।

বড় দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম—ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিকমতো মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চিৎকার করে জিগ্যেস করে—ওটা কি বাবা! আর ওটা! আর ঐখানে! আমি ওকে দেখিয়ে দিই—ওটা নাগরদোলা। ঐটা সার্কাসের তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপরভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ঐ যে দেখা যাচ্ছে তাকে—আকাশের কাছাকাছি উঠে হি হি করে হেসে হাত নাড়ছে—সাঁই করে নেমে আসছে আবার—আবার উঠে যাচ্ছে—সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম দেয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘন্টার সার্কাস দেখলাম দু'জন। দুই মাথাওলা মানুষ, সিংগিং ডল,

আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা থেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ঐ তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে! দোকানে সাজানো একগাদা হুইশল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে, যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রঙচঙে বল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে....ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু.... আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম—খামোকা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ—ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হল, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল। হাপু-উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম....

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড় দুরন্ত ছেলে! দেখেননি? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল জ্বলজ্বলে দুটো দুষ্টু চোখ...না, না, ঐ পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়—যদিও অনেকটা একইরকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না—খুবই সাধারণ চেহারা, অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত—এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন্ জন—ঠিক কোন্ জন আমার হাপু—আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন্ জন—ঠিক কোন্ জন—বুঝলেন না, ওর মাও একবার ঠিক করতে পারেনি—। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই যে আমি—এই আমিই ওর বাবা—। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে—কাইন্ডলি, ভুলে যাবেন না—

তোমার উদ্দেশে

"In search of you, in search of you....."

ওইখানে তুমি থাকো। ওই সাদা বাড়িটায়, যার চূড়ায় শ্বেতপাথরের পরীটাকে বহু দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন তোমাদের ব্যালকনি, বড় বড় জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে লাগানো এয়ারকুলার। মসৃণ সবুজ লনে বুড়ো একটা স্প্যানিয়েল কুকুর ঘুমিয়ে আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, এসব এক পুরুষের ব্যাপার নয়। জন্মের পর থেকেই তুমি দেখেছ খিলান-গম্বুজ, বড় ঘর, ছাদের ওপর ডানা মেলে-দেওয়া পরী—যা কেবলই উড়ে যেতে চায়। যায় না।

বিকেলের রাস্তায় ক্বচিৎ চোখে পড়ে কালো যুবতী আয়া মন্থর পায়ে প্র্যাম ঠেলে নিয়ে চলেছে। কদাচিৎ দু-একজন ভবঘুরে লক্ষহীন চোখ চেয়ে হেঁটে যায়। বড় সুন্দর অভিজাত নিস্তব্ধতা তোমাদের। তাই যদিও আমার পথে পড়ে না, তবু আমি মাঝে মাঝে তোমাদের এই নির্জন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে যাই।

আজ দেখলুম তোমাকে। তুমি একা হেঁটে যাচ্ছিলে।

যখন ক্বচিৎ কখনো তুমি এরকম হেঁটে যাও, তখনই বলতে কি তোমার সঙ্গে এক সমতলে আমার দেখা হয়। আজ যেমন। নইলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখি তোমাদের মভ্ রঙের মোটর গাড়িতে। হুহু করে চলে যাও।

তোমাদের পুরোনো মোটর গাড়িটার কোনো গোলমাল ছিল কি আজ! কিংবা নিকেলের চশমা চোখে তোমাদের সেই বুড়ো ড্রাইভারটার!

অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখলুম এই শীতকালে তুমি বেশ কৃশ হয়ে গেছ। সাদা শাড়ি পরেছিলে, তবু কচি সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছিল তোমাকে। সুন্দর অভ্যাস তোমার—শাড়ির আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীর ঢেকে দাও, মুখ নিচু করে হাঁটো—যেন কিছু খুঁজতে খুঁজতে চলেছ। নাকি পাছে কারো চোখে চোখ পড়ে যায় সেই ভয়েই তোমার ওই সতর্কতা। ও-রকম মুখ নিচু করে যাও বলেই বোধহয় তুমি কোনোদিন লক্ষ করোনি আমায়। আজকেও না।

মোড়ের মাথায় রঙ্গন গাছের ছায়ায় যে লাল ডাকবাক্সটা আছে তুমি সেটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁক নিলে। তোমাকে আর দেখা গেল না। এত কাছ দিয়ে গেলে আজ যে, বোধহয় তোমার আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল একটুক্ষণের জন্য তোমার পিছু নেই। নিলুম না। কেননা ফাঁকা রাস্তার মোড় থেকে বেঁটে, মোটাসোটা, কালো টুপি পরা লাল ডাকবাক্সটা স্থির গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল তোমার পিছু নিতে গেলেই সে গটগট করে হেঁটে এসে আমার পথ আটকাবে।

একটু আগে আমি এই মোড় পেরিয়ে এলুম। বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূরে এক গাড়িবারান্দার

তলায় দেখলুম জটলা করছে পাড়ায় বখাটে ছেলেরা। বড় রাস্তাতেও রয়েছে নির্বোধ পুরুষের ভিড়। একা ওইভাবে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে তুমি যত দূরে আছ, সুরক্ষিত আছ, অনেকের কাছ থেকে কিন্তু তুমি তত দূর নও। আমি তাই অনেকক্ষণ ভাবলুম তুমি ঠিকঠাক চলে যেতে পেরেছিলে কিনা।

তোমাদের পাড়া ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কয়েকটা ভিখিরির ছেলে-মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। রুক্ষ চুল, করুণ চোখ, কৃশ চেহারা। লক্ষ করলুম একটি ছেলের মাথায় ঠোঙার মুকুট, একটি মেয়ের গলায় শুকনো গাঁদা ফুলের মালা। কাছেই ফুটপাথের কোথাও বসে এতক্ষণ বর-বউ খেলছিল বোধহয়। কিছু সময় তারা আমার পিছু নিল। 'দাও না, দাও না।' উল্টো দিক থেকে ধীরগতিতে হেঁটে আসছিল একজন পুলিশ। কাছাকাছি হতে হঠাৎ কী ভেবে সে তার হাতের ব্যাটনটা দুলিয়ে বলল, 'ভাগ।' বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেলে সে একবার আমার দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তির হাসি হাসল। আমিও হাসলুম। বাচ্চাগুলো দূর থেকে চেঁচিয়ে বোধহয় আমাকেই বলছিল 'ভাগ! ভাগ!'

২

রাত সোয়া ন'টায় সোমেনের পড়ার ঘরের পাশে হলঘর থেকে ওদের পুরোনো প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটায় পিয়ানোর টুংটাং বেজে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে হাই তুললাম। সোমেন তার বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল।

চলে আসছিলুম, সোমেন ডাকল, 'মাস্টারমশাই।'

'বলো।'

'কাল সবাই বরানগর যাচ্ছি, মাসিমার বাড়ি। পড়বো না।'

'আচ্ছা।'

'আর মাস্টারমশাই....' বলে ও লাজুক মুখে একটু হাসল।

'কী হল?'

কথা না বলে ও ইঙ্গিতে হলঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। হল ার পেরিয়ে ওদের অন্দরমহল। আজ হলঘরটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে অন্ধকার থাকে। বললুম, 'তুমি না এস ও পি সি-তে বক্সিং করো! একটা অন্ধকার হলঘর পার হতে পারো না! বলতে বলতে কাঁধে হাত রাখলুম। কিছুদিন আগে পৈতে হওয়ার পর মাথার চুল এখানো ছোটো ছোটো—আর দণ্ডিঘরের ব্রহ্মচর্যের আভা এখনো ওর সমস্ত শরীরে ফুটে আছে।

'এই ঘরে তোমার দাদু মারা গিয়েছিলেন না! বেঁচে থাকতে যিনি তোমাকে অত ভালবাসতেন, মরার পর কি তিনি তোমাকে ভয় দেখাতে আসবেন?'

শুনে সামান্য শিউরে উঠল সোমেন। আমি ওর মাথায় হাত রাখলুম। কখনো যখন হোম-টাস্কের খাতার দিকে ঝুঁকে থাকা ওর মনোযোগী মুখে টেবিল বাতির সবুজ ঢাকনার আলো এসে পড়ে, কিংবা যখন কখনো ভুলে যাওয়া পড়া মনে করার চেষ্টায় ও দাঁতে ঠোঁট চেপে, হাত মুঠো করে অসহায় চোখে টাল-মাটাল তাকায় তখন আমার কখনো কখনো মনে হয়—এই সুন্দর, পবিত্র ছেলেটি আমার। এই আমার ছেলে

সোমেন—যার হাতে রাজাপাট দিয়ে খুব শিগগিরই একদিন আমি বানপ্রস্থে যাব।

আমি হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সোমেন এক ছুটে অন্ধকার হলঘর পার হয়ে গেল।

আমাদের বাসার সদর দরজার ছিটকিনিটা বাইরে থেকেই খোলা যায়। প্রথমে দরজাটা টেনে বন্ধ করো। তারপর ডানদিকের পাল্লাটা আস্তে চেপে ধরো। খুব অল্প একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে দাও বাঁ-হাতের আঙুল। এইবার আঙুলটা ডানদিকে বেঁকিয়ে দিলেই তুমি ছিটকিনির মুখটা নাগালে পাবে। সেটা ওপরে তুলে ঘোরাও। তারপর ছেড়ে দাও। ঠক করে ছিটকিনি খুলে যাবে।

রাত সাড়ে দশটায় কৌশলে সদরের ছিটকিনি খুলে, অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। বাতি জ্বলছে। মার বিছানায় মশারি ফেলা। মার জেগে থাকার কোনো শব্দ শোনা যায় না।

রান্নাঘরে আমার ভাতের ঢাকনা খুলে বেড়ালে মাছ খেয়ে গেছে। মা টেরও পায়নি। আজকাল বড় সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে মা। বয়স হচ্ছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুকের ওপর ঝুঁকে নেমে আসা মাথা। খেয়াল হতে চমকে জেগে উঠে জিগ্যেস করে, 'কী বলছিলাম যেন!' আমি হেসে বলি, 'কিছু না মা, কিছু না।'

রান্নাঘরের জানালার একটি শার্সি ভাঙা! মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঝোল, আর তার সঙ্গে এখানে-ওখানে বেড়ালের পায়ের ছাপ। ভাঙা শার্সিওলা জানালাটা পর্যন্ত গেছে। ভাতের পাশে কালচে আর মেরুন রঙের দুটো তরকারি, হাতল ভাঙা কাপে হলুদ ডাল! রাতে ঠান্ডা এই খাবারের দিকে চেয়ে মনে হয় মুখে দিলে বড় বিস্বাদ লাগবে।

খেয়ে ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরাব, মা ঘুমের মধ্যেই 'অঃ' শব্দ করে পাশ ফিরল।

'কে!'

'আমি।'

মা চৌকির শব্দ করে উঠে বলল, 'দেখ তো, একটা চিঠি এসেছে বিকেলে। চোখে ভাল দেখি না। দেখ তো। কর্তার চিঠি মনে হয়।'

মশারির ভিতর থেকে হাত বের করে মা আমার হাতে চিঠি দিল, 'জোরে পড়।'

কালচে রঙের পাকিস্তানী পোস্টকার্ডের ওপরে ইংরেজিতে লেখা—'কালী। তার নীচে পাঠ : 'পরমকল্যাণবরেষু বাবা রম, ইতিপূর্বে তোমার নিকটে কার্ডে পত্র দিয়াছি তাহা পাইয়াছ কিনা জানাইও। তোমাদের চিঠি না পাইলে চাঞ্চল্য ও চিন্তা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখুনি অসুখ অশান্তি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়—চোখে ভালরূপ দেখিতে পারি না বলিয়া নানারূপ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বর্তমান অবস্থা ব্যবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তাড়াতাড়ি কোনো কিছু না হইলে অবস্থা ক্রমশ জটিল ও সঙ্কটাপন্ন হইবে। তোমার কাগজাত ঢাকা আসিলে অবশ্য খবর পাওয়া যাইত। অনিলের সহিত যোগাযোগ করিও। ঐ সঙ্গে কলিকাতা পাকিস্তানী হাই-কমিশনার বরাবর দরখাস্ত দিয়া তাহাতে অনুমতি পাইবার ব্যাপারে রিকমেন্ড করাইয়া পাঠাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কারণ এখানকার ডি আই

জি হইতে পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও দুষ্প্রাপ্য জানিবা।...বলিয়াছিলাম, বরং মুসলমান হইব তবু ভিটা ছাড়িব না।.....অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি....তোমরা নিকটে না থাকায় অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল বোধ করি। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, রিকমেন্ড থাকিলে কাজের সুবিধা হইবে।....দেরি হইলে আরো বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া পড়িব...তোমাদের সহিত আর দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে মরিতে চাহি। তোমার গুড়া কাকিমার মাথার কিছু বিকৃতি দেখা দিয়াছে—আজ চার-পাঁচ-মাস যাবৎ নানারূপ চিকিৎসা চলিতেছে।...সোনারপুরে আমাদের যে জমি তাহাতে অন্তত দুইখানি দুই চালা তোলার চেষ্টা করিও। বর্তমান যে দুঃসময় দেখা দিয়াছে তাহাতে মিতব্যয়ী না হইলে নিরুপায় হইবা। সাবধানে থাকিও মঙ্গল জানাইও। অন্যান্য এক প্রকার। ইতি আং তোমার বাবা।"

চিঠি শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সারাদিন তুই করিস কী? সার্টিফিকেটটার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করলে যদি হয়, করিস না কেন! অনিলের কাছে যা—ও অত বড় চাকরি করে, ঠিক বের করে দেবে।'

'যাব।'

'যাস! বুড়ো বয়সে এখন জেদ কমেছে লোকটার, এইবেলা নিয়ে আয়।'

মা মশারির ভিতরে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, চোখে কেমন কুয়াশার মতো দেখি আজকাল। কর্তা আসবে, তার আগেই একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস তো!'

আমি মার মশারি তুলে দিয়ে ভিতরে পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুলুম। 'মশা ঢুকছে না!' বলে ছোট্টো একটু ধমক দিয়ে মা আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী এত খরচ করিস! এতদিন একটু আধটু জমালে দুটো দোচালা সত্যিই উঠে যেত। একটু গাছ-গাছালি লাগাতে পারতুম। নিজেদের বাগানের ফল-পাকুড় খাই না কত দিন!'

'একটু আদর করো না সোনা মা!'

৩

আমার সামনের রাস্তায় হঠাৎ পড়ে লাফিয়ে উঠল একটা লাল বল। এমন চমকে উঠেছিলুম! তারপরই শোনা গেল সামনের হলুদ বাড়িটার দেওয়ালের আড়াল থেকে বাচ্চা ছেলেদের চিৎকার, 'ওভারবাউন্ডারি....ওভারবাউন্ডারি!...মিলনের একুশ।' শুনে আমি আপন মনে হেসে উঠলুম।

পিছনের পার্কটায় দেখে এলুম এক পাল কাকের সভা বসেছে। আর খোলা মাঠে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে খেলছে বাতাস। মোড় ফিরতেই মুখোমুখি দেখা হল সেই মোটা, লাল ডাকবাক্সটার সঙ্গে। দূরে দেখা যায় তোমাদের বাড়ির চূড়ায় পরীটাকে—আকাশের দিকে বাড়ানো এক হাত—অন্য হাতে সে তার বাঁদিকের স্তন ছুঁয়ে আছে।

এখন দুপুর। রাধাচূড়া গাছের তলায় জলের ড্রাম, পেতলের থালা, আর ছাতুর ঝুড়ি সাজিয়ে বসেছে এক অল্পবয়সি ছাতুওয়ালা। তাকে ঘিরে রিক্‌শওয়ালাদের ভিড়। এক হাত খাবারের থালায় রেখে অন্য হাতে লোভী পাখিপক্ষীদের তাড়াতে তাড়াতে যখন মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে তখন মনে হয় ঐ খাবারের সঙ্গে আকাশ, মাটি ও উদ্ভিদের বড়ো মায়া মিশে আছে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে বসে যাই।

চমৎকার দিন আজ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। শীতের খর বাতাস বইছে।

তুমি আজ কোথাও ছিলে না। যখন তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়া হেঁটে গেলুম তখন দেখি একটা ঘাস-ছাঁটা কল বাগানময় ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মালী। ব্যালকনিতে দুটো ডেকচেয়ার। তোমাদের অর্ধবৃত্তাকার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে একা একটা স্কুটার, যার রং ছানার জলের মতো সবুজ।

সারা দুপুর আমি আজ ভুলতে পারলুম না—ঐ ঘাস-ছাঁটা কল, দুটো ডেকচেয়ার, আর ঐ সবুজ এক একটা স্কুটার।

৪

আজ প্রথম পিরিয়ডে আমি ক্লাসে ছাত্রদের ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের ভিতরে তখনকার গার্হস্থ্য চিত্র আর সমাজজীবন বিষয়ে একটা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে জানালার কাছে এসে যখন দাঁড়ালুম তখন দেখা যাচ্ছে আকাশে নিচু একটু মেঘ। বৃষ্টি হবে কি! বৃষ্টির আগে ভেজা মাটির যে গন্ধ পাওয়া যায় আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম। বৃষ্টি এল না! শেষ ক্লাস ছিল সেভেন-এ। ওরা গেল ক্লাস লীগে ক্রিকেট খেলতে। টিফিনে তাই ছুটি পেয়ে বেরিয়ে আসছি, গিরিজা হালদার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সই করুন।' চটপট সই করে দিলুম! হালদার গজগজ করতে করতে কমন-রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কিসে সই করলেন, একবার পড়েও দেখলেন না।' চেঁচিয়ে বললুম, 'যে কোনো আন্দোলনই করুন—আমি সঙ্গে আছি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।' বেরিয়ে এসে খুশি মনে দেখলুম ঝক্‌ঝক্ করছে দিন।

পাবলিক ইউরিন্যালের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা অনেক অশ্লীল কথার মধ্যে কে লিখে গেছে—গোপাল আর নেই। 'গোপাল' থেকে পেন্সিলের হাল্কা রেখা 'নাই'-তে এসে গভীর। যেন-বা হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধ! লেখা নেই, তবু মনে হয় হতাশার 'হায় গোপাল' থেকে শুরু, শেষে এসে রাগ—'নাই, কেন?' লেখা আছে— গোপাল আর নাই। আমি পড়লুম—'হায়! গোপাল!' পড়লুম, 'গোপাল আর নাই কেন?'

বেরিয়ে আসছি, দেখি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামের স্টপে ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা মুখ! সুধাকর না! কলেজ টিমের দুর্দান্ত লেফট আউট ছিল! দেখি গায়ে চর্বি জমেছে, থল্‌থল্ করছে ভুড়ি, কাঁধে ঝুলছে শান্তিনিকেতনের ঝোলা ব্যাগ। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল।

ফার্স্ট ডিভিশনেও কিছুদিন খেলেছিল সুধাকর। তখন ওর দৌলতে ডে স্লিপে কত খেলা দেখেছি। মনে পড়ে লাইটহাউসে দুজনে দশ আনার লাইন দিতে গেছি, দুটো অচেনা ছেলে লাইন থেকে ডেকে বলল, 'আপনি এস সেন না?' সুধাকর মাথা নাড়ল—হ্যাঁ। 'আসুন না, এখানে জায়গা করে দিচ্ছি।' লাইনে দাঁড়িয়ে সুধাকর চাপা গলায় বলেছিল, 'কিরে শালা দেখলি!'

চার বছর আগে শেষ দেখা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে। তখন ওর মায়ের ক্যান্সার। ইউটেরাসে। দুজনে চৌরঙ্গী পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলুম। বললে, 'খেলা ছাড়ার পরই একটা মজার চাকরি পেয়ে গেছি ভাই। কনস্ট্রাকশনে। কাজকর্ম কিছু বুঝি না, কিন্তু এধার-ওধার থেকে কেমন করে যেন পয়সা এসে যায়!' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি ইম্‌মর‍্যাল নই, খেলার মাঠেও মার না খেলে কখনো মারিনি।'

তখন শীত শেষ হয়ে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে, তবু সুধাকরের গায়ে ছিল একটা পুরোনো ব্লেজার—বুকের কাছে মনোগ্রাম করা, যেন চোখ পাকিয়ে বলছিল—আমি খেলোয়াড় সুধাকর।

আমি ওকে ডাকলুম না। দূর থেকে দেখলুম ধুতি-পাঞ্জাবি-চপ্পল পরা মোটা থল্‌থলে সুধাকর যেন সবাইকে দেখিয়ে চলন্ত ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে চটপটে পায়ে পা-দানিতে উঠে গেল।

সন্ধেবেলায় কফি হাউসে অনেকের সঙ্গে দেখা। অমর ফিরেছে বিলেত থেকে অনেক দিন পর। আড্ডা তাই জমজমাট ছিল। অমররা সিং। পাঞ্জাবী শিখ। বাঙালি হয়ে গেছে। আগে দাড়ি গোঁফ পাগড়ি ছিল না।

আজ দেখি জালে ঢাকা দাড়ি, মাথায় জরির চুমকি দেওয়া পাগড়ি। বললুম, 'আগে না তুই ছিল মেকানাইজড শিখ! তবে আবার কেন দাড়ি গোঁফ পাগড়ি, হাতে কেন তোর বালা?'

হাতজোড় করে বলল, 'রিলিজন নয় ভাই, এ আমার পলিটিক্স। বিলেতে গিয়ে দেখি ইন্ডিয়ানদের পাত্তা দেয় না। আমার গায়ের রং ফরসা, অনেকেই সাহেব বলে ভুল করে, খাতির-যত্ন পাই। কেমন লেগে গেল সেন্টিমেন্টে। তাই দাড়ি গজিয়ে পাগড়ি বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—ইন্ডিয়ানদের যা পাওনা তাই দাও আমাকে। খাতির চাই না।

রাত আটটার সময় ওরা উঠে গেল মদের দোকানে। সেলিব্রেট করবে। আমি গেলুম না। যাওয়ার সময় তুলসী আড়ালে ডেকে বলে গেল, 'অনিমেষকে একবার দেখতে যাস। ওর অসুখ।'

'কী অসুখ!'

মুখ টিপে হেসে বলল, 'বলছিল, অসুখের নাম মীরা। দেখিস গিয়ে।'

৫

রাত সাড়ে ন'টায় আমি লন্ডনের এক অচেনা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলুম। চারদিক হিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে। একটা দোতলা বাস হল্টে থেমে আছে, বাস-এর পিছনে বিজ্ঞাপন—'সিনজানো'। চোখে পড়ে অদ্ভুত পুরোনো ধরনের গথিক লাইটপোস্ট, ভিকটোরীয় দালানের ভারী স্থাপত্য, পিছনে দূরে বহুতল স্কাইক্র্যাপারের জানালায় আলোর আভাস। ওভারকোটের পকেটে আমার দুই হাত। আমি হেঁটে যাব। সামনের যেকোনো পাব-এ রহস্যময়ভাবে ঢুকে আমি খেয়ে নেবো এক গ্লাস বিয়ার, অল্প গুনগুন করে গাইব ঐ অচেনা শব্দটি বা কিনা কোনো মদের নাম—'সি-ই-ন-জা-আনু-ও-ও'। ঘরে ফেরার আগে আমি কোনো হোটেলের বলরুমে ঢুকে নেচে নেবো দু চক্কর নাচ, 'হেঃ এ, টুইস্ট, টুইস্ট, টুইস্ট।'

আমি দূর বিদেশে পৌঁছে গেছি আজ। ঘন কুয়াশার পর্দা সরালেই দেখা যাবে আমার চারধারে জীবন্ত এই ছবি।

চেনা রাস্তাঘাট আজ আর চেনা যাচ্ছিল না। বিবর্ণ দেয়াল, ছেঁড়া পোস্টার, কালো ক্ষয়া চেহারার মানুষ—এই সবই ঢাকা পড়েছিল। কলকাতায় বড় সুন্দর ছিল আজকের

কুয়াশা। হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ধরিয়ে নিলুম একটা সিগারেট। ট্রাফিকে সবচেয়ে সুন্দর আর ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি ঝলসে উঠলে স্টেটবাসের গিয়ার বদলানোর শব্দ হয়েছিল। জ্বলে উঠল সবুজ। 'আস্তে ভাই ট্যাক্সিওয়ালা' বলতে বলতে আমি ডান হাত ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে তুলে ধরে দুই লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

আমার যাওয়ার কথা বকুলবাগান, সেদিকে না গিয়ে আমি মোড় নিলুম ডাইনে, এসে দাঁড়ালুম আদিগঙ্গার পোলের ওপর। আমার পায়ের তলা দিয়ে অন্ধকার রেলগাড়ির মতো বয়ে চলেছে জল। না, গঙ্গা কোথায়! এ তো রাইন। অদূরে ট্রাফল্‌গার স্কোয়ার থেকে ভেসে আসছে রাতের ঘুমভাঙা কবুতরের পাখার শব্দ, আমার পিছনে অস্পষ্ট ইফেল টাওয়ার, সামনে বহুদূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, বাঁয়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে শম্ভুগঞ্জের দিকে ভেসে চলেছে গুদারা নৌকা। কুয়াশার আবডাল সরে গেলেই সব দেখা যাবে। কিংবা বলা যায়, কুয়াশার আবডালেই বহু দূরের সব কিছু পুরোনো এই কলকাতার হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে। কাছে আসবার এই তো সুসময়—বর্ষায়, বা ঝড়ে, বা কুয়াশায়! ভালবাসায় একাকার হয়ে যায় পৃথিবী, সমুদ্র তার তট অতিক্রম করে উত্তাল হয়ে আসে স্থলভূমির দিকে, আমাদের চেনা শহরে ফুটে ওঠে অচেনা বিদেশের ছবি।

আজ রাতে তুমি একবারও খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে কি? যদি দাঁড়াও, তবে—আমার মনে হয়, তুমি টের পাবে তোমাদের বাড়ির চূড়ার শ্বেতপাথরের পরীটা কুয়াশার আড়ালে তার মার্বেলের ভিত ছেড়ে উড়ে গেছে মোড়ের ওই লাল রঙের বেঁটে ডাকবাক্সটার কাছে। বহুকালের পুরোনো তাদের প্রেম—কেউ কখনো টেরও পায়নি। এখন পায়ের কোনো শব্দ না করে যদি তুমি ছাদে উঠে যেতে পারো তবে দেখবে—পরীটা সত্যিই নেই।

নাকি রাতের ডাকে চিঠিপত্র চলে গেছে বলে হাল্কা সেই ডাকবাক্সটাই বেলুনের মতো উড়ে এসেছে তোমাদের ছাদে! পরীটার কাছে! এখন তাই ডাকবাক্সটা খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর ভুলো মানুষেরা ভাবছে—কোথায় গেল আমাদের এতকালের চেনা সেই ডাকবাক্স! নাকি আমাদেরই রাস্তা ভুল!

৬

অনিমেষ একা থাকে। অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম।

শুয়ে আছে। দেখলুম নাকটা অল্প ফুলে লাল হয়ে আছে। মুখের এখানে ওখানে ফাটা-ছেঁড়া, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত টানা লম্বা একটি কালশিটের দাগ।

আমাকে দেখে কনুইয়ে ভর রেখে উঠবার চেষ্টায় মুখ ভয়ঙ্কর বিকৃত করে বলল, 'চারটে লোক! বুঝলি, চারটি লোক ফিলজফি পালটে দিয়ে গেল।'

'কী হয়েছে তোর?'

'কী জানি! একা পড়ে আছি, সিগারেট এনে দেওয়ারও লোক নেই। আর শালা দুপুরটা যে কি লম্বা মনে হয়!'

'চারটে লোক কারা?'

পাশ ফিরে বলল, 'চিনি না! নাইট শো দেখে ট্যাক্সিতে ফিরছি, তখন রাত বারোটা।

আমার ঘরের সামনে ঐ যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, মাঠের মতো, বড় রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে যেই মাঠে পা দিয়েছি, টের পেলুম ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আবছা চারটে লোক। তক্ষুনি কেন যেন মনে হল—বিপদ। ফিরে দেখলুম ট্যাক্সিটা ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার ডাকি। ততক্ষণে চারটে লোক চটপটে পায়ে এসে আমার চারধারে দাঁড়াল। মুখোমুখি যে, তার হাতে একটা সাইকেল চেন। জিজ্ঞাসা করল—তুমি শালা অনিমেষ চৌধুরী? মীরার সঙ্গে তোমারই ভাব? বোঁ করে চেনটা এসে মুখে লাগল। পড়ে যাচ্ছিলুম, ধরে বলল, ঘরে চল। ঘরে নিয়ে এল! আমি তালা খুললে চারজনেই ঢুকল ঘরে। বলল, তোমাকে কাট মারতে হবে। আমি অল্প টলছিলুম, মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগছিল, তবু ওদের কথা বুঝলুম। বললুম, কেন? বলল, মীরার সঙ্গে বিয়ে হবে হরির। ছেলেবেলা থেকে ওদের ভাব, মাঝখানে তুমি কে? হরিকে আমি চিনি, মীরাদের বাসায় কাজকর্মে আসে, ছুতোরের কাজ করে, জগুবাজারে দোকান আছে। আমি মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, মীরা শিক্ষিতা মেয়ে, হরিকে বিয়ে করবে কেন? আমার বুকে আঙুল ঠুকে বলল, কেন, শালা শিক্ষিতা মেয়ের শরীরে ফুল ফোটে না? পাঁতা গজায় না? হাসল, বিয়ে করতে না চায়, আমরা জোর করে দেব। সমাজের ব্যবস্থা আমরা পাল্টে দিচ্ছি শিগগিরই। তোমাকে চিঠি লিখতে হবে। লেখ। ওরা বলে গেল, আমি লিখলুম—প্রিয় মীরা, তোমার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই। কাল থেকে তোমার সঙ্গে কাট। দেখা হলে আমাকে না চিনবার চেষ্টা কোরো। আমি তোমাকে আর ভালবাসি না। ইতি অনুতপ্ত অনিমেষ। লেখা হলে ওরা একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দাও। দিলুম। তারপর ওরা আমাকে মারল, মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল মেঝেয়। বলে গেল, 'যদি কথার নড়চড় হয় তবে আবার দেখা হবে, না হলে গুডবাই।'

অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে চকমকে চোখে হাসল, মীরা এসেছিল দু'দিন পর। দরজা খুললুম না। বাইরে থেকেই বলল, 'অফিসে তোমাকে ফোন করে পাইনি। তুমি এত খারাপ বাংলা লেখো, জানতুম না। এ চিঠি তুমি লিখেছ?' শান্তভাবে বললুম, হ্যাঁ। জিগ্যেস করল, কেন? বললুম—

'কী বললি!'

ধপ করে বালিশ মাথা ফেলে অনিমেষ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, 'দুর শালা! সে অনেক কথা। ছেড়ে দে। তোর কাছে যে ক'টা সিগারেট আছে দিয়ে যা।'

আমার সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বালিশের পাশে রাখল, 'মীরার কথা এখন আর ভাবছিই না। ভাবছি ঐ চারটে লোকের কথা। কী আত্মবিশ্বাস! আমাকে দিয়ে ঐ চিঠি লিখিয়ে নিল, আমার ঘরে ঢুকে মেরে গেল আমাকে, বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমার জোর কতখানি। আমি শালা হারামির বাচ্ছা এতদিন ভদ্রলোক....'

রাতে বেড়াল খুঁজতে গিয়ে মা পড়ে গিয়েছিল উনুনের ধারে। হাঁটুতে চোট। একটা আঙুল সামান্য পুড়েছে। ডাক্তার বলে গেল—হাই প্রেসার, সাবধানে রাখবেন। খুব বিশ্রাম। আর নুন বারণ।

পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'কেন মা, এত কাজকর্ম করতে যাও?'

মা মিনমিন করে বলল, 'বউ আন।'

স্বপ্ন দেখলুম।

আমার চোখের সামনে দেয়ালের পর দেয়ালের সারি। আর সেই অসংখ্য দেয়ালের গায়ে কে যেন অবিশ্রাম চক্ দিয়ে লিখে যাচ্ছে—গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। গোপাল আর নাই। কোথাও লেখা—'হায় গোপাল!' কোথাও বা—'গোপাল আর নাই কেন?' আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিয়ের 'স্বাগতম' লিখবার লাল শালুতে উড়ছে করপোরেশনের বিজ্ঞাপন, বসন্ত—টীকা নিন। বিপদ—টীকা নিন। ভয়—টীকা নিন।

৭

দেখলুম স্টিয়ারিং হুইলে তোমার দুই অসহায় হাত, অহঙ্কারে একটু উঁচু তোমার মাথা। কপালের ওপর নেমে এসে দুলছে চুলের একটা ঘুরলি। দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছ। তোমার কপালে ঘাম। তোমার মুখ লাল। পাশে খাকি শার্ট পরা নিকেলের চশমা চোখে বুড়ো সেই ড্রাইভার। একটু ডান দিকে হেলে সে তার একখানি সাবধানী হাত বাড়িয়ে রেখেছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তোমার হাতের দিকে।

বড় ভালবাসায় তোমাকে আগলে নিয়ে গেল তোমাদের পুরোনো মভ্ রঙের গাড়ি। মোড়ের বেঁটে মোটা লাল ডাকবাক্সটা তার কালো টুপি পরা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাপি মোটোরিং মাদ্‌মোয়াজেল, হ্যাপি মোটোরিং।' বাড়ির চূড়া থেকে শ্বেতপাথরের পরীটা পুব থেকে পশ্চিম মাথা ঘুরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত একবার দেখে নিল—কোনো বিপদ আছে কি না। যত দূরেই যাও, সে তোমাকে ঠিক চোখে চোখে রাখে।

যদিও একটু টাল খাচ্ছিল তোমার গাড়ি, তবু বলি, তুমি অনেকটা শিখে গেছ। আর ক'দিন পরেই তুমি তোমার গাড়ি একা চালিয়ে নিয়ে যাবে।

চোখ বুজে দেখলুম, দূরে রাসবিহারীর জংশনে ট্রাফিকের লাল আলোয় থেমে আছ তুমি।

থেমেছিলে? নাকি অপেক্ষা করেছিলে?

দেখো একদিন আমি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দাঁড়াব তোমাদের ঐ মভ্ রঙের মোটর গাড়িটার মুখোমুখি। চেঁচিয়ে হয়তো বলব, 'বাঁচাও', কিংবা হয়তো বলব, 'মারো আমাকে।' কুয়াশায় বা ঝড়ে বা বৃষ্টিপাতে কোনোদিন সেই সুসময় দেখা দিলে, তখন আর ওই দুই শব্দের আলাদা মানে নেই।

৮

ফেব্রুয়ারি। কলকাতায় এবারের শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম। রাস্তায় খুব ধুলো উড়ছে। চারদিকেই রাগী ও বিরক্ত মানুষের মুখ।

বিদায়ী শীতের সম্মানে একদিন স্কুল কামাই করা গেল। 'ম্যাটিনীতে' বেলেল্লা একটা হিন্দী ছবি দেখলুম। আমি আর তুলসী। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি। লবিতে দাঁড়িয়ে তুলসী হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরছিল। বললুম, 'তোর জমবে না কিছুই। তোর হাতে

জল দাঁড়ায় না।' অসময়ে বৃষ্টি, তবু রাস্তায় জল জমে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ। হাতে স্যান্ডেল, কাপড় গুটিয়ে দুজনে ছপ করে জলে নামলুম। হঠাৎ অকারণে খুশি গলায় তুলসী বলল, 'পৃথিবী জায়গাটা মন্দ নয়, কী বলিস!'

পাড়ার চেনা ডাক্তার ধরে একদিন টি এ বি সি দিয়ে দিল। দু'দিন জ্বরে পড়ে রইলুম। মা কাছাকাছি ঘুরঘুর করে গেল বারবার। এমন ভাব—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস, হতভাগ্য ছেলে, এবার পেয়েছি তোকে। তৃতীয় দিনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলুম। সকালেই দেখি, মা বাক্স খুলে কবেকার পুরোনো লালপেড়ে গরদের শাড়িটা বের করে পরেছে। 'কী ব্যাপার?' মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হাসল 'কাল রাতে একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি।' মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর জ্বরটাও সারল। কালীঘাটে একটু পুজো দিয়ে আসি।'

আমি আর গিরিজা হালদার স্কুল থেকে একসঙ্গে বেরোলুম একদিন। হালদার গলা নামিয়ে বলল, 'আমার জীবনে একটা ট্র্যাজেডি আছে মশাই। আপনাকে বলব একদিন।' পরমুহূর্তেই রুমাল বের করে বলল, 'গরম পড়ে গেল।' রেস্টুরেন্টে বসলুম দুজনে, গিরিজা হালদার কাটলেট খেল না, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো টোস্ট। আমার মশাই নিরামিষ। দেখেন না হিন্দুর বিধবারা কতদিন বাঁচে।' হালদার প্রাণায়াম-টানায়াম করে। দম বন্ধ করে এক গ্লাস জল খেয়ে মুখ মুছে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লক্ষ্য করেছেন কলকাতায় অনেকদিন কিছুই ঘটছে না! না লাঠিচার্জ, না, গোলাগুলি, না কারফিউ! তেমন বড়সড় একটা মিছিলও দেখছি না বহুকাল। লোকগুলো মরে গেছে, কি বলেন!' অন্যমনস্কভাবে বললুম, 'হুঁ।' হালদার টেবিলে আঙুল বাজিয়ে গুনগুন করল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে....'

দূর গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপরে উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। অন্যমনে সাড়া দিই—'যাই।'

রাতে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম, 'মা, ও মা, তুমি আমায় ডাকলে।' মা জেগে উঠে অবাক গলায় বলল, 'না তো' বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে বলল, 'ঘুমো।' চৌকির শব্দ করে পাশ ফিরল মা, বলল, 'বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না রে!' আমি নিঃশব্দে হাসলুম, 'না তো!'

তারপর অনেকক্ষণ জেগে থাকি। মারও ঘুম আসে না। বলে, 'সারাদিন কী যে করিস। ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনদের একটু খোঁজখবরও তো নিতে হয়! আমি মরলে আর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে কে না কে!' মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'বুঝতেও পারি না, কে বেঁচে আছে, আর কে মরে গেছে। একটু খোঁজ নিস।' জবাব দিই, 'কে কোথায় থাকে মা!' মা আস্তে আস্তে বলে যায়, 'কেন, মাঝেরহাটে তোর রাঙাকাকিমা, কাঁচড়াপাড়ায় সোনা ভাই....', শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মনে পড়ে, ছুটির এক দুপুরে বসেছিলুম ছোটো একটা চায়ের দোকানে। চারটে টেবিল, প্রতি টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার, আর সবুজ পর্দাওলা দুটো কেবিন খালি পড়ে আছে। মাছি ওড়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়ালে ভয়ঙ্কর সব যুবতিদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার! দুপুরের ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে অনেকক্ষণ একা বসেছিলুম। এ সময়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সাদা চাদর গায়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক। চোখে চোখ পড়তেই

আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। বড় দয়ালু ওঁর চোখ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম উনি মনে মনে বললেন, 'এই যে, কী খবর?' তটস্থ আমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে উত্তর দিলুম 'এই যে, সব ভালো তো?' পরমুহূর্তেই উনি চোখ সরিয়ে নিলেন, গিয়ে বসলেন কোণের একটা চেয়ারে, পত্রিকা খুলে মুখ আড়াল করে নিলেন। আমি টেবিলের কাচে আমার অন্ধকার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। সেই ভাবটুকু তারপর কেটে গিয়েছিল, যখন সদ্য ঘুম-থেকে-ওঠা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে চা দিয়ে গেল।

একদিন স্কুলে এল টেলিফোন! 'শিগগির বাড়িতে আসুন।' শরীর হিম হয়ে এল। রিসিভার নামিয়ে রাখলুম আস্তে আস্তে। দীর্ঘদিন ধরে যেন এ রকম একটি আহ্বানেরই ভয় ছিল আমার। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে 'মা' এই শব্দ বেজে উঠেছিল। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি এসে দেখলুম ঘরে চার-পাঁচজন পাড়া-পড়শী, বালিশে মার নিস্তব্ধ মুখ, আধখোলা চোখ ভয়ঙ্কর লাল, ঠোঁট ফ্যাকাসে। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসারের পারদের দিকে চেয়ে আছে। বলল—'তাড়াতাড়ি করুন।' বুঝতে না পেরে আমি চারদিকে চেয়ে বললুম, 'কী?' আবার কে যেন বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন।' আমি বুঝতে পারলুম না, বাচ্চা ছেলের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী?' বাড়িওয়ালার বউ আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বলল, 'যা তারকেশ্বরে মানত করে আয়!'

পরদিন। আমি তারকেশ্বর থেকে ফিরছিলুম। ভিড়ের ট্রেন! আমি বসবার জায়গা পাইনি। ট্রেন থামছে। প্রতিবার আমি মফস্বলের লোকের মতো নিজেকেই জিগ্যেস করছি, 'এটা কি হাওড়া? এই কি হওড়া?' অনেক ঘাড়, অনেক মাথার জঙ্গল সামনে, আমি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ এক ঝলক তেতো জল। জলে ভেসে গেল মুখ, কষ বেয়ে জামা-কাপড় ভাসিয়ে দিল, 'এটা কি হাওড়া' আবার এই প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখি চোখের সামনে নড়ছে কালো-চাদর, ঝড়ের মতো ছুটছে ট্রেন, অথচ যেন বাতাস লাগছে না। পড়ে যাচ্ছি, কয়েকটা হাত আমাকে ধরল। টের পেলুম, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবীর সব শব্দ—যেন আমি আবার মায়ের কোলের সেই শিশু রম—এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। তবু সেই আধ-চেতনার মধ্যে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আপনারা সবাই শুনুন। আমি রমেন। আমার মায়ের বড়ো অসুখ। দু'দিন আমি তাই কিছুই খাইনি।' আমি বলতে চাইছিলুম, 'আমি দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের সকলের কাছে অপরাধী।' আমার প্রাণপণে বলবার ইচ্ছে হয়েছিল, 'আমি আজ আপনাদের ইচ্ছাশক্তিগুলি ভিক্ষা চাই। আপনাদের আশীর্বাদগুলি ভিক্ষা চাই।' ট্রেনের মেঝেয় ঘোর অন্ধকারের ভিতরে দুটো সাদা পা। যেন চেনা! মুখ দেখা যায় না, তবু বুঝলুম সেই বুড়ো ভদ্রলোক। আজও তার চোখ কথা বলছিল! 'আমি তোমার জন্যই এসেছি রমেন। তুমি ভাগ্যবান! চলে এসো।' আমি কাঁদছিলুম, 'আমার মার বড় অসুখ। আমার বাবা বিদেশে পড়ে আছে।' সহজ উত্তর দিল না তার চোখ, বলল, 'জীবন ও মৃত্যুই কিছু লোকের দেখাশোনা করে; কিছু লোককে দেখে ভাগ্য; কিছু লোককে ধর্ম এসে নিয়ে যায়।'

ভাল হয়ে গেলে মা একদিন চিন্তিত মুখে বলল, 'চোখে ভাল দেখি না। কিন্তু মনে

হচ্ছে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস!' হাসলুম, 'কই!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, 'আর কর্তার সার্টিফিকেটটা? সেটা পেলি না!'

৯

তখন বিকেল। পাকিস্তানী হাই-কমিশনারের অফিস থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে যাব, এমন সময় হঠাৎ দেখি—তুমি! শিকড়সুদ্ধ আমার ডালপালা নাড়া খেয়ে গেল।

বলতে কি, স্কুটারের পিছনের সিটে তোমাকে মানায় না। এত খোলামেলা আর এত ভিড়ের মধ্যে।

দেখলুম সবুজ রুমালে ঘিরেছো মুখ, আজ নীল শাড়ি পরেছিলে, স্কুটারের পিছনের সিটে তুমি জড়োসড়ো, টালমাটাল। চওড়া পুরুষের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হাসছিলে ভয় পাওয়া হাসি—'পড়ে গেলু—উ-উম।'

তারপরই অবহেলায় আমাকে পিছনে ফেলে রেখে ছুটে গেল তোমাদের স্কুটার। যেতে যেতে আচমকা ঘুরে গেল বাঁয়ে—পড়ো পড়ো হল, পড়ে গেল না। তোমরা গেলে পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

আমি গড়িয়াহাট রোড ধরলুম। অপরাহ্নের আলোয় ফুটপাথে আমার দীর্ঘ ছায়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে অচেনা মানুষ। তাদের ছায়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। সামনেই ট্রাফিক পুলিসের উত্তোলিত হাত, আর গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে আছে। একজন হকার আমাকে উদ্দেশ করে ধীর গম্ভীর গলায় হাঁকল, 'গেঞ্জি....'! এসব কিছুই আমি তেমন খেয়াল করলুম না। আমার মন গুনগুন করছিল, কেন তুমি কোনো দিনই লক্ষ করলে না আমায়! 'হায়, আমি যে আছি তুমি তো জানোই না!'

রাতে ঘুম না এলে জেগে থেকে মাঝে মাঝে বড়ো সাধ হয়, তুমি এসে একদিন বলবে, 'আমাকে চাও?'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আমি শান্ত চোখে চেয়ে বলব, 'চাই না।'

পটুয়া নিবারণ

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ—কিন্তু তাঁর ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝতো না। সেই অর্থে পট-টট কখনো আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরনধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সব কিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতর দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে—বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তার পা, বিরাট ঢাউস পেটটা বাঘের মেরুদন্ড পর্যন্ত ফুলে আছে, তার মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়-পরিণত ভ্রূণটিকেও দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুই জনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার গোঁফ ঝুলে গেছে, অকালবার্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?'

'পাপের পরিণাম' সিরিজে যে কখানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করেছে—এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'সূক্ষ্মদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম-অভ্যাস।'

আমাদের নিশিদারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হল। শক্ত ব্যামো। হরি ডাক্তার এসে বলে গেল 'সর্বনাশ! এ মেয়ে বাঁচলে হয়! অসুখ শরীরের যতটা, মনেও ততটা। মন ভাল রাখা চাই। ওকে কখনো কোনো অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা বারণ, কোনো মৃত্যুর খবর দেওয়া বারণ। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হল। শেফালীর ঘর থেকে ধুলো ময়লা, কালো ঝুল, পিকদানী, ইঁদুর আরশোলা দূর করে দেওয়া হল, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভালো থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারণ। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারো মুণ্ডই যথাস্থানে নেই। এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে রয়েছে; আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার

পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসাব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার সদ্যোজাত সন্তানকে বৃক্ষচ্যুত ফলের মতো স্বহস্তে ধারণ করছে, আশপাশে ইতস্তত কয়েকটা রাক্ষসশিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আশু সন্তান-ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এইসব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক হরি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে শেফালী একদিন টুক্ করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি-আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম মারকে ছবি দিয়েই ঠেকাতে চাইতেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি-আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেবার জোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল শেফালীর ঘরে গাছপালা, লতা, ফুল, পাখির ছবি এঁকে দেবেন নিবারণ, যাতে ঘরে বসেও শেফালীর মনে হবে যে তার চারিদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখি মেঘ ও বাতাস রয়েছে—প্রকৃতি-টকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় কিছুকাল প্রকৃতি-ভক্ষণ করলে শেফালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত হরি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ভাঁটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা গেল পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। স্বপ্নের ভিতরেও তিনি স্বচ্ছ পেটওয়ালা বাঘ, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও রাক্ষসীর সন্তান ভক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং রুগ্ণ অশক্ত বৃদ্ধ অবস্থায় কোনো সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন—ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্তসমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি-আঁকা ভুলবার জন্য তিনি অন্যদিক মন দিলেন। কখনো দেখা যেতে লাগল নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন, নয়তো ছাঁচতলা থেকে কন্টিকারির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়তো বিয়ে করবেন।

করলেনও।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যে সব খেলা দেখাতেন, আজকাল আর তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেইসব খেলা দেখিয়েই দারুণ নাম হয়েছিল মিস্ কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা

জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন সর্বভুক মহিলা মিস্ কে. নন্দীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস্ কে. নন্দীর জন্য প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল—যার চারদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা আরম্ভ হলে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস্ কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হত রিঙয়ের পাশে। হে-হৈ পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস্ কে. নন্দীকে দেখা যেত না—খাঁচার চারপাশে কালো পর্দা ফেলা। ওর ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কিনা বা থাকলেও কি করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে ক্রমে ট্রাপিজের খেলা, দড়ির ওপর নাচ, ভৌতিক চক্ষু এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পর্দা সরিয়ে একটা গোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলত 'অলরাইট'। দু-তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিত। হাততালিতে কানপাতা দায় হত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস্ কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে। রং কালো। পরনে গোলাপী রঙের সাটিনের হাফ প্যান্ট, বুকে কাঁচুলি—সেও গোলাপী রঙের সাটিনের। মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, পায়ে গোলাপী মোজা, গোলাপী জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল বসে থাকতেন মিস্ কে. নন্দী—আধবোজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়তো সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে তঁকে। একটা মুরগিকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হত খাঁচার ভিতরে—কোক্কর কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস্ কে. নন্দীকে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু লাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত কে. নন্দীর পেটে, কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ঐ শব্দেই ক্ষেপে যেতেন মিস্ কে. নন্দী। মুরগিটার সঙ্গে তার প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত— সেই প্রাণান্তকর পাখা ঝাপটানোর শব্দ, মুরগির অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দীর দাঁত কড়মড় করবার শব্দে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুরগির ধরা পড়ত অবশেষে—ততক্ষণ মিস্ কে. নন্দীর কৌশলে বাঁধা-চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দুহাতে টেনে মুরগির মুণ্ডুটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুরগির গলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস নির্গত হতে থাকত বলে তখন তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট্ করে ছিঁড়ে যেত গলাটা—মুণ্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে কে. নন্দী ধড়টাকে দু'হাতে ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাওয়ার ভঙ্গিতে রক্তপান করতেন মিস্ কে. নন্দী। তখন কষ বেয়ে, গোলাপী কাঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে চুঁইয়ে গোলাপী জুতো পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুরগিটাকে খেতে শুরু করতেন—দু'হাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঙ্গলে কামড় বসাচ্ছেন—এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কি না বলতে পারি না।

মুরগি খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা দেহে মুরগির পালক, নাড়ীভুঁড়ি ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতেন মিস্ কে. নন্দী। তখনো তাঁর অভিনয়

কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। স্যুট পরা ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন 'লেডী গণপতি দেখু-উ-উ-ন্-ন্—'। তার অবাঙালি টানের কথাটা বিট্‌কেল শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ম্যানেজার হাতের সরু সাদা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। পেখমের মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় ভয় পাওয়ার ভান করতেন তিনি—কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে— ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন—আর সারা হাত জুড়ে লিকলিক করে উঠত সাপ, কিল্‌বিল্ করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন—যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম বোঝা যেত—ভঙ্গিতে পেলবতা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখেমুখে বন্য হরিণের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চিৎকার করে উঠত, আমরা চোখ বুজে ফেলতাম। ঐটুকুই ছিল কৌশল। হয়তো চোখ চেয়ে ঠিক মতো দেখলে দেখা যেত বাস্তবিক সাপের মুণ্ডুটাকে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত মুণ্ডহীন সাপের দেহ একখণ্ড দড়ির মতো ঝুলছে, আর সাপের মুড়োটা আরামে চিবোচ্ছেন মিস্ কে. নন্দী।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়তো ঐ জীবন মিস্ কে. নন্দীর আর ভাল লাগছিল না। তাঁর খেলার মধ্যে অনেকটাই অভিনয় ছিল সত্য, কিন্তু কেন সন্দেহ হত ম্যানেজারের লাঠির খোঁচাটা ওর মধ্যেই ছিল খাঁটি। কেননা যখন চেয়ারে এলিয়ে না-ঘুম না-সম্মোহনের ভিতর থাকতেন কে. নন্দী তখন মনে হত তিনি বড়ই ক্লান্ত। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করতে না পারার সেই ক্লান্তিকে দূর করতে যখন কে. নন্দীকে ম্যানেজার সেই সরু লাঠির ডগায় খোঁচা দিতেন, তখন মিস্ কে. নন্দীর জন্য আমি আমার যৌবনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক এখন আর থাকবার কথা নয়। কেননা সময় পাল্টে যাচ্ছিল। মানুষ আর পুরোনো ধরনের খেলা পছন্দ করছিল না। ধীরে ধীরে প্রবর্তক সার্কাসের অবস্থাও খারাপ হয়ে এল।

অবশেষে একদিন সব গোলমাল করে দিলেন মিস্ কে. নন্দী। ম্যানেজারের ডাক, অনুনয় লাঠির খোঁচা নিঃশব্দে হজম করে তিনি আধখোলা চোখে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। মুরগিটা খাঁচার ভিতরে দাপিয়ে বেড়াল। উপায় না দেখে ম্যানেজার সাপের ঝাঁপিটাও ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার মধ্যে। ঢাকনাটাও খুলে দেওয়া হল। সাপটা ফণা মেলে লাফিয়ে উঠল, মুরগিটা খাঁচার ছাদে পা আটকে রেখে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। আর ঠিক এই সময়ে তাঁবু ভর্তি লোককে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস্ কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে

শুরু করলেন। কিন্তু ঐ একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোকে ধরে ফেলেছিল মিস্ কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁবু ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন দরবার করলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপরে একবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিল না। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে কিছু লক্ষ্য করছিলেন। মনে হল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমার দুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম, 'কোন আঙুল!'

উনি ওঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি বললাম, 'না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক বলে মনে হল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম, 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আঁকছেন না!'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেব।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ, 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন, 'এখন থেকে খেতখামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য-আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর-নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের শিয়রে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত; মেয়েটি সাপটাকে দেখছে—অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়—তাই মেয়েটি যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ খুক্ খুক্ করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল—ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ি ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হল সম্মোহন কেটে গেছে—সেই আধোঘুম ও অর্ধস্বপ্ন থেকে ম্যানেজারের লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক খাদ্যবস্তুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না বলে তিনি বোধহয় সুখী। কিংবা কে জানে—আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানারকম গল্প প্রচলিত হচ্ছিল। কিন্তু সার্কাসের সর্বভুক

মহিলার সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দীও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ বাইরের জগৎ থেকে দু'জনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। একরকম ভাবে তাঁর আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন, 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম, 'ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারছি না। তবে মিস কে. নন্দীকে আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ-সিদ্ধ?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কী?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে স্তূপাকৃতি পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে-দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন, 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কী বলে! সেটা শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে. নন্দী?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার সন্দেহ ছিল কাঁচা মুরগি ও সাপের মাথা খাওয়ার ভিতর কোনো শিল্প নেই; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মনে হয় ধারণাটা ভুল।'

আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বললেন, সার্কাসে আপনারা কুসুমকে দেখেছেন, আমি দেখিনি। আমি ওর কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ-মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ, 'কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনো কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'হয়তো এটা জীবন সময় অনেক কিছুর জন্যই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পটুয়া—তাঁর চিন্তার কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল—এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল মজার। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হল—নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনিতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কি দেখে নিলেন, ফিরে

এসে নিজের ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ চেয়ে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি কুসুম ছাঁচবেড়ার ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না।

নিবারণ বললেন, 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা খায়—তা খেয়ে কুসুমের তৃপ্তি হয় না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম—না। আমার গা শিউরে উঠছিল।

নিবারণ বললেন, 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। ও প্রথমে রাজি হল না। বলল—সার্কাস যা দেখাত তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধ্য-সাধনায় রাজি হল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা কাঁচা মুরগি খেল ও। সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর।' বললেন নিবারণ কর্মকার— তাঁর মুখচোখে ভয় ফুটে উঠছিল—যেন চোখের সামনে গভীর রাত্রে একা এক পিশাচ-মহিলার সামনে বসে থাকার সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এখনো তাড়া করছে। একটু দম নিয়ে বললেন, 'কল্পনা করুন ঘরের বউ যাকে খুব চিনি জানি বলে মনে হয়—হঠাৎ গভীর রাতে তার চেহারা ও স্বভাব বদলে যেতে দেখলে কি মনে হয়!'

আমার কিছুই বলার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বলল, 'কিন্তু ভেবে দেখলে এ ব্যাপারে বোধহয় ভয়ঙ্কর কিছু নেই।' বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন নিবারণ, তারপর প্রায় আপন মনে বললেন, 'ছবি আঁকার সঙ্গে এর তফাত কী? আমি ভেবে দেখেছি—অভ্যাস না কৌশল না অসুখ— কোন্‌টা?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নিবারণ, আবার নিজের ডান হাতের সন্দেহজনক দুটো আঙুলের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন, 'আপনার কি মনে হয় না যে এ ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই?'

'কী রকম?' আমি প্রশ্ন করি।

হাসলেন নিবারণ কর্মকার 'যেমন ছবির ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না। নিশি দারোগার মেয়ের ব্যাপারটা ভেবে দেখুন।'

'দেখব।' বললাম। কেমন সন্দেহ হল নিবারণের মাথায় কোনো অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হঠাৎ এক সময়ে বললেন, 'আমার আঙুলগুলো তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে'—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কুসুমকে বলে দেখব, যদি ও আমার ছবি-আঁকার আঙুল দুটো খেয়ে ফেলতে পারে।' বলেই পুরোনো ধরনের খিক্‌খিক্ হাসি হাসলেন নিবারণ। হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনারা কুসুমকে ভয় করেন, না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। পাগল আর কাকে বলে! যখন চলে আসি তখনো নিবারণ বিড়বিড় করে যা বলছিলেন তার অর্থ—ওঁর ছবি-আঁকার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

আমরা ভেবেছিলাম মিস্ কে. নন্দী দেবী চৌধুরানীর মতো প্রফুল্লে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কোথাও কোনো গোলমাল থেকে গেল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা কে. নন্দী কিংবা নিবারণ কারুরই এই গাঁয়ে থাকা পছন্দ করছিল না। তারা বলে বেড়াচ্ছিল কে. নন্দী এবার তাঁর শেষ খেলা দেখাবেন। তিনি বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না মহিলা—সাপ মুরগির পর এবার তিনি আরো বড় কিছুর জন্য হাঁ করেছেন। নিবারণের বিপদ ঘনিয়ে এল বলে। মনে হচ্ছিল কে. নন্দীর সেই শেষ খেলাটা দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

ছবি-আঁকা ছেড়েই দিলেন নিবারণ। ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, একদিন তা প্রমাণ পাওয়া গেল। গাজনের বাজনা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন তিনি। চড়কে উঠলেন—হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করলেন এবং এইসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত রক্তাক্ত শরীরে অবশেষে বুড়ো শিবতলার বটগাছের নীচে লুটিয়ে পড়লেন। কে. নন্দীর সেবা-যত্নে তাঁর শরীর ক্রমশ সুস্থ হল, কিন্তু রোখ কমল না। পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর বুড়ো বাচ্চা সকলকেই ডেকে তাঁর ডানহাতটা দেখান 'দ্যাখো তো, আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?'

এই সময়ে একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কষ্টে চিনতে পারলেন আমায়। বললেন, 'শুনেছেন কিছু? নিশি দারোগা বলে পাঠিয়েছে যে কুসুমকে ত্যাগ করতে হবে। আশ্চর্য!'

আমি কিছু বললাম না। নিবারণের পিঠে হাত রাখলাম। নিবারণ নিজেই বলে চললেন, 'কুসুম চলে গেলে আমার আঁকার কী হবে!'

'আপনি আবার আঁকছেন?'

'না।' মাথা নাড়লেন নিবারণ, 'আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু কুসুমকে আপনারা ভয় পান কেন? আমি তো দেখছি কুসুম সার্কাসে যা করত তাও একটা খেলা। ছবি আঁকা যেমন খেলা, ঠিক তেমনি। কিন্তু মুশকিল—আমরা কেউই অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।' বলেই হঠাৎ হা হা করে হাসলেন নিবারণ 'কয়েকদিন আগে আমি একটা পায়রা মারলাম। তারপর ঘাড় মটকে সেটা গলার নলীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মুখ দিতে প্রবৃত্তি হল না। কিন্তু দেখবেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।'

কয়েকদিন পর নিবারণকে বাস্তবিক দেখা গেল বনভূমির মাঠে—একপাল ছেলেপুলে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, আর মাঝখানে নিবারণ একটা আধমরা কবুতরের পালক দু'হাতে পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ছেন, কাঁচা মাংসের জঙ্গলে ব্যগ্র কামড় বসাচ্ছেন। তাঁর মুখের বিস্বাদ, বমনোদ্রেক সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

এরপর প্রায় সব কিছুই ভক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন নিবারণ। মাঝে মাঝে জ্যান্ত পাঁঠা-ছাগল কামড়ে ধরেন, কুকুরকে তাড়া করে ফেরেন। দু'বার গাঁয়ের লোক তাঁকে বাঁশ পেটা করে আধমরা করল। লোকে নিবারণের নামের আগে 'পাগলা' কথাটা জুড়ে দিল।

আমার মনে হয় নিবারণ ঠিক পাগল হয়ে যাননি। কে. নন্দী সার্কাসে যখন মুরগি এবং সাপ ভক্ষণ করতেন—তখনই কেউ তাঁকে পাগল বলেনি, বরং অনেকদূর থেকে পয়সা খরচ করে দেখতে গেছে। নিবারণ সম্পর্কে আমার এই মনে হয় যে তিনি তাঁর

শিল্পের অভ্যাস পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন মাত্র। মনে হয়েছিল ছবি ছেড়ে বাস্তবিক তাঁর শিল্পগুলি এইবার তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাই শিল্পান্তরে যেতে চাইছিলেন মাত্র।

এর কিছুদিন পরে একদল বেদে এল আমাদের গাঁয়ে। নানারকম খেলা দেখাল, ওষুধপত্র শিকড়বাকড় বিক্রি করল। তারপর একদিন ছাউনি গুটিয়ে চলে গেল।

দু'একদিন পর নিবারণ আমার কাছে এসে বললেন, 'আমার স্ত্রী কুসুমকে আপনি চিনতেন?'

আমি মাথা নাড়ালাম—হ্যাঁ।

হঠাৎ খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন নিবারণ, বললেন, 'কুসুমের সার্কাসের খেলাগুলো কিন্তু তেমন সাংঘাতিক কিছু ছিল না। ওর চেয়ে সাংঘাতিক খেলা আমিই আপনাকে দেখাতে পারি।'

আমি নিবারণকে দেখছিলাম—আগেকার মতোই আছেন নিবারণ। লক্ষ্য করলাম তিনি আর তাঁর ডানহাতের দিকে চাইছেন না এবং তাঁর বগলে মোড়কের মধ্যে কয়েকটা ছবি রয়েছে বলে মনে হল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

খিক্‌খিক্ করে হাসলেন নিবারণ 'কুসুমের সেই খেলাটার কথা বলছিলাম। সেই খেলাগুলো আমিই কুসুমকে দেখাতে শুরু করলাম। কুসুম কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। খেলা দেখাত কুসুম, কিন্তু ঐ খেলা নিজে কখনো দেখেনি সে।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার মতোই অবস্থা হল কুসুমের। তার শিল্পও তাকে আক্রমণ শুরু করল।'

আমি চেয়েছিলাম। খানিকটা আন্দাজ করে বিস্মিত না হ'য়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'কে. নন্দী কোথায়?'

'ঠিক জানি না। একদল বেদে এসেছিল লক্ষ্য করেছেন?' আমি বুঝলাম। চুপ করে থেকে হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, 'আপনার আঙুল?'

নিবারণ উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে ছবিগুলোর মোড়ক খুলে আমার সামনে পেতে দিলেন। প্রথম ছবিটাতে ছিল দুটো ভয়ঙ্কর কালসাপ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি আর ছবিগুলো দেখলাম না। দেখবার দরকারও ছিল না।

বুঝলাম, পটুয়া নিবারণকে এবার ঠেকানো মুশকিল হবে। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর অস্তিত্বের অপরাংশ তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্রোহী যাবতীয় ভয়ঙ্করতাও হিংস্রতাকে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

মুনিয়ার চারদিক

লেবুগাছের গোড়া থেকে মুখ তুলল কালো একটা সাপ। মুখ তুলে সে একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখল। শীতের কুয়াশায় আবছা সকাল, রোদ এখনো নিস্তেজ সোনালি। সেই সুন্দর আলোয় ডালিম গাছের ডগায় একটি ছোট্ট ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুনিয়া। দু পায়ের আঙুলের ওপর ভর, দেহটি টান, উৎকণ্ঠ মুখটি ওপরে তোলা, দু কাঁধে এলো চুল ভেঙে পড়েছে। তার সোনালি ফ্রক, নীল একটি সালোয়ার, পায়ে চপ্পল, মাথায় ডালিমপাতা খসে পড়েছে, পায়ে শিশির আর কুটোকাটা। বড় সুন্দর সকালটি, মেয়েটি সুন্দর, যেমন সুন্দর আলো—সাপটা দেখল। কিন্তু শীত বাতাসে তার শরীর অসাড় হয়ে আসে, কেঁপে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লেবুগাছের গোড়ায় তার গর্তর দিকে এগোয়। তার শরীর পাকে পাকে খুলে দীর্ঘ হয়ে যেতে থাকে। এত দীর্ঘ হয় যে তা প্রায় ডালিম গাছের গোড়া পর্যন্ত চলে যায়, যেখানে মুনিয়ার গোড়ালি।

বাঁ হাতে একটি ডাল টেনে নামায় মুনিয়া। সে ডালটার টানে গাছটা ঝুঁকে আসে। ডান হাতে বড় ডালটা ধরে মুনিয়া। ক্রমে ছোট্ট ডালিমটা নাগালে আসে। মুনিয়া ছিঁড়ে নেয় ফলটা। দাঁতে ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসে। শ্বাস ফেলে। তারপর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাতে ডালিম ফল, তাতে কয়েকটা লালচে সবুজ পাতা।

তীব্র ব্যথায় কালো সাপ তার মুখখানা ফিরিয়ে দেখে। সেই সুন্দর আলো, সুন্দর মেয়েটি। কালো সাপ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শ্বাস ফেলে। শরীর টেনে নিয়ে চলে যেতে চায় উষ্ণ গর্তটিকে। সে ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করে, সুন্দর শীতের বেলাটিকে দেখে।

মুনিয়া কিছুই টের পায় না। সুন্দর শিশিরে ভেজা ডালিমটা তার হাতে। সে বড় অন্যমনস্ক। ফুটফুটে চপ্পল-পরা পা বাড়িয়ে সে এক পা এগোয়।

ব্যথায় নীল হয়ে যায় কালো সাপ। তার দীর্ঘ দেহের কোনো উৎস থেকে অন্ধকারের স্রোতের মতো তীব্র রাগ ফুটে আসে, আসে হিংসা, ভয়। শীত ভুলে সে তার শরীর তুলে দোল খায়। তারপর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে যাওয়ার সময় সে ভিক্ষুকের মতো রিক্ত বোধ করে। মুনিয়ার কাছে, সুন্দর শীতের বেলাটির কাছে।

মুনিয়া প্রথমে ভারি অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে। এত অপ্রত্যাশিত, এত অদ্ভুত। কালো সাপটা তার পায়ের ওপর দিয়ে ছলকে সরে যায় এক ঝলক ছোট ঢেউয়ের জল যেন। তার ফুটফুটে সাদা পায়ের পাতায় দুটি ছুঁচের মুখের মতো লাল ফোঁটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। সমস্ত শরীর ঝিন্-ঝিন্ করে, শরীরের ভিতর বিদ্যুতের মতো চমকায়।

একটু সময় লাগে বুঝতে। তারপর বোঝে মুনিয়া।

—মা—গো—ও—

খুব ভোরবেলায় উঠে পরাগ অনেকটা দৌড়োয়। পায়ে কেডস্, গায়ে গরম জামা, পরনে খাটো প্যান্ট। দৌড়ে এসে সে খানিকটা জিরোয়। তারপর খোলা ছাদে উঠে

আসে। অনেকগুলো বেন্ডিং করে, পা তুলে লাফায়, হাজার স্কিপিং করে। করতে করতে নটা বেজে যায়। শীতের বেলা, তাই বেলা বোঝা যায় না। কুয়াশায় জড়ানো রোদে সোনালি রং লেগে থাকে, ভোরের মতো। এ বছর সে একটা বড় টিমে ফুটবল খেলবে—এই কথা ভাবতে ভাবতে পরাগ তার শরীরে আর মনে এক রকমের উষ্ণ আনন্দ বোধ করে। তার পোষা চন্দনা পাখিটিকে কাঁধে নিয়ে সে ব্যায়ামের শেষে সারা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। হাতে মুঠো ভর্তি ভেজা ছোলা, আর আদার কুচি। সে খায়, খায় তার পাখিটা একই মুঠো থেকে। পাখিটা তার আঙুল কামড়ে ধরে। পা দিয়ে তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করে। পরাগ হাসে, পাখির মোলায়েম গায়ে তার কিশোর গাল ঘষে দেয়। পাখি তার পায়ের থাবায় পরাগের হাতের আঙুল জড়িয়ে দোল খায়।

এ সময়ে প্রতিদিনই ছাদের দক্ষিণের রেলিং দিয়ে ঝুঁকলে সে মুনিয়াদের বাগান দেখতে পায়। মুনিয়াদের বাগানে গাছপালা ঘন, সবুজ। মুনিয়া বাগানে ঘোরে। ফুল তোলে, পেয়ারা পাড়ে, কখনো সখনো পরাগদের ছাদের দিকে তাকায়। পরাগ তার পাখিকে আদর করতে করতে মুনিয়াদের বাগানে রোজ সকালে মুনিয়াকে দেখতে ভালবাসে।

আজও দেখছিল। সোনালি ফ্রক পরনে, আর নীল সালোয়ার, গলার নরম সাদা একটা মাফলার—মুনিয়া এই বেশে ডালিমের উঁচু ডাল থেকে ডালিম পাড়ছে।

পাখিটা তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করছে, হাতের আঙুল দিয়ে একটা ছোলা ফেলে দিল পরাগ। পাখিটা লাফিয়ে নামল। মুনিয়ার টান শরীরখানা ধীরে ধীরে ডালিমের নাগাল পাচ্ছে—এই দৃশ্য কুয়াশা ভেদ করে আগ্রহভরে দেখছিল পরাগ। দেখছিল, কেমন সুন্দর সাদা হাতে পাতাসুদ্ধু ডালিমটা ছিঁড়ে আনল মুনিয়া। সে ঝুঁকে বলতে যাচ্ছিল—মুনিয়া, কী রে?

ঠিক সে সময়ে কালো বিদ্যুৎ স্পর্শ করল মুনিয়াকে। পরাগ কুয়াশায় কিছু দেখেনি। শুধু দেখল, মুনিয়া উবু হয়ে বসে পা চেপে ধরেছে, ডাকছে—মা গো—

পরাগ তার মুঠো খুলে ভেজা ছোলা ছড়িয়ে দিল, ভুলে গেল তার প্রিয় পাখিটাকে। সে দৌড়ে ছাদের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে নামল। পাখিটিও শুনেছিল মুনিয়ার সর্বনাশের ডাক। তবু নির্বিকার লাফিয়ে ঘুরতে লাগল গড়ানো ছোলার ওপর। ঘুরতে লাগল, আর আনন্দে পাখা ঝাপ্‌টে চিৎকার করতে লাগল।

দীর্ঘদিন লক-আউটের পর কারখানা খুলছে। খুলবার আশা ছিলই না প্রায়! একবার শোনা গিয়েছিল, মালিক কারখানা তুলে নিয়ে যাচ্ছে গুজরাটে। আর একবার শোনা গেল, কারখানা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই সুবিনয় ভোরবেলা এসেছে কারখানায়। দূর থেকে দেখতে পেত কারখানার গেট-এর সামনে নীরব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে পতাকা, ফেস্টুন, বুকে ব্যাজ, কিন্তু মুখে নিরাশা। কারখানার দেয়াল জুড়ে দাবিপত্র। প্রতিদিন একই দৃশ্য। নীরবে প্রতিটি ভোরে কারখানার সামনে সেই নৈরাশ্যপীড়িত জমায়েতের মুখোমুখি দাঁড়াত সুবিনয়। মাঝে মাঝে তারও মন কেমন ডুবজলে নেমে যেত। বুকটা গ্রীষ্মের প্রান্তরের মতো শূন্য লাগত, তবু তারই মুখ চেয়ে এতজন শ্রমিক—সে এদের নেতা—এই বোধ সর্বক্ষণ তাকে উস্কে রেখেছে। পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আনছেন কার্ল মার্কস। আরো কত লড়াই পড়ে আছে। এ তো সামান্য একটা

কারখানার কয়েকজন শ্রমিক, আর লড়াইটাও ছোট—যার কথা খবরের কাগজে খুব ছোটো হরফে বেরোয়। এইসব ভেবে সুবিনয় মনের জোর ফিরিয়ে আনত।

যদি সত্যিই কারখানা গুজরাটে চলে যেত, কিংবা হত হাতবদল? সে অবস্থার কথাও ভেবে রেখেছিল সুবিনয়। রমলার সেলাই-ফোঁড়াইয়ের হাত ভাল, তাকে একটা সেলাই-মেসিন কিনে দিত সে! মুনিয়াকে ইস্কুলে ছাড়িয়ে আনত। আর তার অবশ্য একটু পুরোনো এল-এমই ডিপ্লোমা আছে—কিন্তু সে মার্কামারা লোক বলে এবং কারখানাগুলির অবস্থা ভাল না বলে কিছুতেই চাকরি পেত না—ফলে সে হয়ে যেত পার্টির হোলটাইমার। বাড়িটা তার নিজের। পাকিস্তান হওয়ার পর বাবা সেখানকার সম্পত্তির সঙ্গে বদল করে বাড়িটা পেয়েছিলেন। অনেকটা জমি, বাগান। বাড়িটা বরাবরই তাকে পার্টির হোলটাইমার হতে এক ধরনের জোর দিয়েছে।

কিন্তু অতটা কিছু হয়নি। কারখানা খুলেছে। সুবিনয় লড়াইটা জেতেনি। শ্রমিকেরা দু'দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে। অবস্থাটা সামলে দেওয়া যায়নি। মালিক সুযোগ বুঝে তাদের ডেকে কয়েকটা এলোমেলো শর্ত মেনে নিল, 'আপনারাই তো জিতলেন' এরকম একখানা ভাব করল। সেই ভাবটা বজায় রাখতে হল সুবিনয়দেরও।

অবশেষে কারখানা খুলেছে।

ইন্সপেক্শন ডিপার্টমেন্টের ঘরটির দুই দিকে কেবল কাচের আবরণ। আলোয় টৈ-টুম্বুর ঘর। বাইরে এখনো সকালের কুয়াশার আবছায়া, রোদ রাঙা। সেই রাঙা রোদে ঘরে একটা আনন্দিত উৎসবের আভা। সুবিনয় খুব মন দিয়ে একটা যন্ত্রাংশের মাপ নিচ্ছিল। টেবিলে এক পাশে একটা গরম চায়ের কাপ। হাতের কাজটি নামিয়ে রেখে সে চায়ে চুমুক দেয়। অসম্ভব সুন্দর সকালবেলাটিকে দেখে। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলে তার কেবলই মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। মানুষের জন্য মস্ত লড়াই পড়ে আছে এশিয়া জুড়ে, আর সে পড়ে আছে কোন কোণে। তার শোয়ার ঘরে মাথার কাছে আছে কার্ল মার্কসের একখানা ছবি। স্মিত মুখ, তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। যতবার সেই মুখ মনে পড়ে ততবার সুবিনয় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয়, এ ঠিক জীবন নয়, অন্যতর এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য! পূর্ব এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কার্ল মার্কস। কাচের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে কুয়াশার জড়ানো রোদ, সুন্দর সকাল, সুবিনয় অন্য মনে চেয়ে থাকে, চায়ে চুমুক দেয়।

—সুবিনয় চৌধুরী—ইন্সপেক্শনের সুবিনয় চৌধুরী—আপনার ফোন—ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে—শিগগির যান—

ডিপার্টমেন্টের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে। ঝামেলা। কথায় কথায় ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া সুবিনয় পছন্দ করে না। লোকটা শত্রুপক্ষের। যদিও সুবিনয়ের এই চাকরিটা পাওয়ার পিছনে লোকটার হাত ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন দেখা হলেই ভ্রূ কোঁচকায়, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আগে 'সুবিনয়' বলে ডাকত, এখন ডাকবার নিতান্ত দরকার পড়লে 'মিস্টার চৌধুরী' বলে ডাকে!

ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখে আজ একটু ভাবান্তর ছিল। ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, তবে সেটা বিরক্তিতে নয়, দুশ্চিন্তায়। সুবিনয়কে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলল—দেখুন।

একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা গলা আক্রমণ করে তাকে—কে! সুবিনয় চৌধুরী? আমি—আমি পরাগ বলছি কাকাবাবু—

—পরাগ! ভারি অবাক হয় সুবিনয়—কে পরাগ?

—আমি সান্যালদের বাড়ির পরাগ—আপনাদের পাশের বাড়ি—

—ওঃ। কী ব্যাপার?

—একবার শিগগির আসুন—

কেমন একটু অনিশ্চয় লাগে সুবিনয়ের, পা দুটো কাঁপে, বুক কাঁপে, গলাটা ঠিক নিজের গলার মতো শোনায় না,—ওঃ, কী হয়েছে। অ্যাঁ, কী ব্যাপার?

—তেমন সিরিয়াস কিছু না, ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট—

—কার?

—মুনিয়ার।

ফোনটা অন্যমনস্ক সুবিনয় ক্র্যাডলে না রেখে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, ওয়ার্কস ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—চলে যান। আমি ছুটির ব্যবস্থা করছি—

বড় অসহায় বোধ করে সুবিনয়, কয়েক পলকের জন্য ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু লোকটিকে ঠিক চিনতে পারে না।

শীতের বেলা পড়ে এল। বড় ঝিলের ওপারে সূর্য ডুবছে। সি-সি-আর-এর রেল লাইনের পাথরে গাঁইতি চালিয়ে ক্লান্ত দুটি লোক উঁচু রেলপথের ধারে ঘাসের ঢালু জমিতে একটু জিরোতে বসে। বিড়ি ধরায়। আকাশে কাচ-স্বচ্ছ কোদালে মেঘের রক্তিম খণ্ডগুলির দিকে ক:ক পলক তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমের দিগন্ত জুড়ে এক নিস্তব্ধ বিশাল রক্তারক্তি কাণ্ড। তারা দুজন খোলা প্রকৃতির রোদ কিংবা বর্ষার বিস্তর দৃশ্য দেখেছে। তাই অবাক হয় না, মুগ্ধও না। কেবল কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে দেয়। সি-সি-আর-এর উঁচু রেলবাঁধের তলায় নিশ্চিন্দার রাস্তা বেয়ে একটা রিকশা ধীরগতিতে চলে যাচ্ছে। লোক দুটির একজন থুথু ফেলে বলে—ঐ দেখ, হামিদ ডাক্তার চলেছে।

—আই। অন্যজন বলে।

—গত বছর খুব বাঁচিয়েছিল মোকে, বুইলে?

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তারা নীরবে রিকশাটাকে লক্ষ করে। ধীরে ধীরে রিকশাটা দৃষ্টির বাইরে যায়।

তখন একজন অন্যজনকে বলে—বুইলে, গত বছর বোশেখের ঝড়ে মোদের দক্ষিণের আমবাগানে আম পড়েছিল মেলাই। মাঝরাতে উঠে দৌড়ে গেনু। অন্ধকারে ভাল ঠাহর হয় না, হাতড়ে হাতড়ে তুলছি কোঁচড়ে, একটু কামড় বসাতেই জিবটা একটু চিন্‌চিন্‌ করল। তেমন কিছু বুইতে পারিনি তখনো। দু-চার কামড় খেতেই পেটে গোঁতলান, মুখে লোত, সারা শরীরে জ্বালা-জ্বালা। ঘন্টাটেকের মধ্যেই মুখে গাঁজলা উঠে এল। রাত না পোয়াতে জি-টি রোডের এক লরি ধরে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল, না সেখানেও জবাব দিয়ে দিলে, বললে—এ তো বিষক্রিয়া, চিকিচ্ছের

বাইরে গেছে। হাসপাতালেই মরি আর কী। এ সময়ে তো আর চৈতন্য ছিল না, পরে শুনেছি। আমার বাপ-ভাই বাইরের ফুটপাথে বসে কাঁদছে, একজন পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে সব শুনে-টুনে বলল, মরবেই যখন তখন একবার হামিদকে দেখিয়ে মরুক। দূর তো নয়। তাই হল। আধমরা আমাকে টেনে নিয়ে এল ও হামিদ ডাক্তারের কাছে। সে বেশি কথা-টথা বলেনি, আমার পা দু'খানা কেবল নেড়ে-চেড়ে দেখে ঠিক দু'পুরিয়া অষুধ দিলে। বললে, এক পুরিষা কষে ঢেলে দাও, ভিতরে যাবে না—না যাক্, ওতে যদি কাজ হয়, যদি চোখের পাতা ফেলে কি পা নাড়ে তো কাল সকালে আর এক পুরিয়া....সাত দিন বাদে আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম।

—ধন্বন্তরী। অন্যজন বলে।

—আই। আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পরনে চেক লুঙ্গি, সাদা ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি, শীতকালে কাঁধে একটা তুষের চাদর, খালি পা, গালে রুখু দাড়ি। তীক্ষ্ণ নাকখানা, তীব্র একজোড়া চোখ। এই হচ্ছে ডাক্তার হামিদ, জি-টি রোডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ যার সম্বন্ধে বিস্তর কিংবদন্তি ছড়ানো রয়েছে গ্রামে গঞ্জে, সমবায় পল্লী, ঘোষপাড়ায়। লোকে পথ চলতে চলতে, কিংবা চায়ের দোকানে বসে, সেলুনে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে সেইসব কিংবদন্তির কথা বলে. শোনে। আবার যে যার পথে চলে যায়। গামে, গঞ্জে, পল্লিতে পাড়ায় পাড়ায় লোক রোগ-ভোগের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করে ডাক্তার হামিদের কথা ভেবে। হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়।

হাসপাতাল থেকে মুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তাদের বাসার বারান্দায় তাকে শোয়ানো হয়েছে। ঠোঁট দুটি নীল। বেলাশেষের আলোয় সেই ডালিম গাছটার ছায়া এসে একটুখানি স্পর্শ করেছে মুনিয়ার পা।

বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে সুবিনয় কিছুই লক্ষ্য করতে পারছিল না। বহু চেষ্টার পর হাসপাতালের ডাক্তার একবার দাঁতে ঠোঁট চেপে হতাশায় আক্ষেপ করে বলেছিল—ডেড্! কিন্তু সে কথা সুবিনয়ের বিশ্বাস হয়নি। ডেড্। কথাটা কেমন যেন! একটা ভারী পাথর খুব গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু পরেই মুনিয়াকে নিয়ে যাবে সবাই। তবু সবাই অপেক্ষা করছে হামিদ ডাক্তারের জন্য। যদি হামিদ পারে! যদি হামিদ পারে!

সুবিনয় এক কোষ জল-বমি করেছে বারান্দার ধারে বসে। এ শরীর যেন আর তার শরীর নয়, এমনই আলগা শিথিল তার হাত পা। কেউ একজন তার কাঁধে হাত রেখে বলছে—ভরসা রাখো। এখনো হামিদ আছে। সে এল বলে।

হামিদ! সুবিনয় যেন বা এ নাম আগে শোনেনি! কে হামিদ? কোথা থেকে সে আসবে! সুবিনয় মুখ তুলে পশ্চিমের আকাশে রক্তিম মেঘখন্ড গুলি দেখে। মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর তীব্র ছটা বহুদূর নীলিমায় ব্যাপ্ত। ঐ কি হামিদের পথ। সে কি রথে আসবে!

মাথাটা কেমন টলটল করে সুবিনয়ের। রমলাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—কেঁদো না। হামিদ আসছে। হামিদ আসছে। ঐ দেখ, চরাচর জুড়ে হামিদের জন্য পাতা হয়েছে পথ। আসছে হামিদ। মুনিয়া অনেক বড় হবে—দেখো।

বুড়ো রিকশাওয়ালা খলিল ঝুঁকে প্যাড্‌ল মারে, শরীর কাত করে শরীরের ভর দেয় প্যাডেলের ওপর। রিকশা ধীরে ধীরে চলে। বুড়ো খলিল কেবল কাশে আর কাশে। রিকশা ধীরে চলে।

রিকশা এসে দাঁড়ায় মুনিয়াদের বারান্দার ধারে, গোলাপী বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের তলায়। রঙিন পাপড়িগুলি শীতের বাতাসে খসে পড়ছে। পাপড়ি খসে পড়ে হামিদের গায়ে, তুষের চাদরে, রিকশার হুডের ওপর। চাপা গুঞ্জন ওঠে—হামিদ! ঐ তো হামিদ।

সুবিনয় মুখ তোলে। শ্যামবর্ণ ছিপ্‌ছিপে হামিদকে দেখে, দেখে তার বুড়ো রিকশাওয়ালাকে। ডেড্‌—এই কথাটা আবার হঠাৎ ভারী পাথরের মতো গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়।

ডালিম গাছের ছায়া কখন এগিয়ে গেছে অনেকটা। তার রং গাঢ়। সিঁদুরে মেঘের আভার আলোর ভিতর দিয়ে গাঢ় কালো ত্রিশূলের মতো ছায়া বিদ্ধ করেছে মুনিয়ার বুক।

খলিল দেখেছে অনেক। সে জানে, সময়মতো হামিদের হাতে পড়লে মানুষ মরে না। তবু মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। নিজেদের শরীরে রোগের লক্ষণ তারা দীর্ঘকাল বুঝতেই পারে না। বুঝতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তারপর অ্যালোপ্যাথির বিষ জমায় শরীরে। রোগের লক্ষণ চাপা পড়লে ভাবে—সেরে গেল। অ্যালোপ্যাথ জবাব দিলে তখন অনতিক্রমনীয় মৃত্যুকে ভোজবাজিতে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা ঈশ্বরের মতো হামিদকে খোঁজে। তাই, মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। মাঝে মাঝে খলিল তার ছানির গ্রহণলাগা চোখে হামিদের মুখখানা বড় মমতাভরে দেখে। দেখে, হামিদের মুখে নানা চিন্তার দৃশ্য। বাচ্চা লড়ছে রোগের সঙ্গে। মানুষের জটিল দেহযন্ত্রর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে হামিদ। লড়াই জমেছে খুব। খলিল তার বুড়ো শরীর হেলিয়ে প্যাড্‌ল মারে আর আপনমনে হাসে। মনে মনে সে আল্লার দয়া ভিক্ষা করে। প্রতিটি লড়াই জিতে আসুক হামিদ। মানুষের ঘরে ঘরে তার নামগান হোক।

ফেরার পথে রিকশা আরও ধীরে চলে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় কাঁচাপথে রিকশা টাল খায়। শীতের বেলা ফুরিয়ে আসে হঠাৎ। উঁচু রেলবাঁধের ছায়ায় ঝুমকো আঁধার নামে পথে। গ্রহণলাগা চোখে সমুখের দিকটা ঠিক ঠাহর হয় না। খলিল রিকশা থামিয়ে নামে, কাঁপা হাতে কোরোসিনের ছোট বাতিটা জ্বেলে নেয়। একপলক হামিদকে দেখে। মুখটা হুডের তালাকার অন্ধকারে, ঋজু রোগা দেহটি স্থির, কোলের ওপর সেই চামড়ার পুরোনো ওষুধের বাক্সটি। ঐ মূর্তি দেখলে খলিলের বুকটা ভয়ে আর সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আল্লার প্রেরিত পুরুষ ঐ বসে আছে তার রিকশায়। এই ধন্বন্তরীকে সে-ই নিয়ে যায় গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায়, পল্লীতে। মিঞা হামিদ—এই নামে কত অন্ধকার বুকে আলো জ্বরে ওঠে! তবু যে মানুষ মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। খলিল তার বুড়ো শরীর নিয়ে আবার রিকশায় ওঠে। প্যাড্‌ল ঠেলতে ঠেলতে বিড়বিড় করে—আল্লা, হামিদকে আরো শক্তি দাও। তার দুই হাত আলোর তলোয়ার হয়ে উঠুক!

যেদিন হামিদের রুগী মরে সেই রাতে খলিল তীব্র আবেগে, গভীর তৃষায় মদ খায়।

জ্বালাময় অন্ধকারে তার শরীর ভেসে যায়। তারপর ক্রমে তার মাথার ভিতরে একটি আলোর ফুলঝুরি ফেটে পড়ে। সে হয়ে যায় চুর-চুর এক আনন্দিত মাতাল।

ফেরার পথটা দীর্ঘ চড়াইয়ের মতো কষ্টকর। ফুটফুটে মেয়েটা মারা গেল। বাঁচল না। খলিল বিড়বিড় করে—হামিদ কী করবে! হামিদের কোনো দোষ নিও না তোমরা—

মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা তৈরি হয়েছে। মুনিয়ার বন্ধুরা সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। কপালে টিপ, চন্দনের ফোঁটা। এলোচুল আঁচড়ে দুটি বেণী ছড়িয়ে দিয়েছে দুধারে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মুনিয়াকে। বোগেনভেলিয়ার পাপড়ি ঝরে পড়ছে শীত বাতাসে, উড়ে এসে রঙিন প্রজাপতির মতো বসছে মুনিয়ার খাটে, শরীরে, চুলে।

খাটের পায়া ধরে পড়ে আছে রমলা। যেতে দেবে না। পাড়ার বউ-ঝিরা ছাড়িয়ে নিচ্ছে তাকে। সুবিনয় এ সব কিছু দেখছে না। হামিদ নামে একজন অলৌকিক পুরুষের আসার কথা ছিল। আকাশে তৈরি হয়েছিল তার আলোকিত পথ। সেই পথে কেউ আসেনি। এক বিশাল শকুন তার ডানা বিস্তার করেছে, চরাচর জুড়ে তারই ছায়া।

নিহত মুনিয়ার শেষ ভেলা চারজন বাহকের কাঁধে দুলে দুলে ভেসে যায়।

অনেক রাতে মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা ফিরছিল। তারা শুনল, চৈতলপাড়ার পথে পথে ক্ষুব্ধ এক বুড়ো মাতালের চিৎকার। চুর-চুর মাতাল খলিল চেঁচিয়ে বলছে— তোমরা সাক্ষী আছো! আমি হামিদের এক ফোঁটা ওষুধও কখনো খাইনি। আমি যদি মরি তবে তার দোষ যেন হামিদকে না অর্সায়। হামিদ ধন্বন্তরী—হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়—বিশ্বাস করো—

অনেক রাতে, ঘুমোবার আগে হামিদ তার সাদা, ছোট, সহজ সরল বিছানাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, নামাজ পড়ার মতো পবিত্র ভঙ্গিতে। প্রতিদিন ঘুমোবার আগে সে এই কথা বলে—আল্লা, আমি তোমার সমকক্ষ নই। মানুষকে তুমি এই বিশ্বাস দিও যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তার সমকক্ষ নয়।

২

মাঘের শেষে এক মাঝরাতে পরাগের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে দেখতে পায় বুকের ওপরে আকাশ। গভীর সমুদ্রের মতো অথৈ। নক্ষত্রের আলো কাঁপছে।

ত্রিপলের একটা কোণ উত্তরের বাতাসে উড়ে গেছে। শীত করছে খুব। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে উঠে বসে পরাগ। এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে রেখেছিল। বালিশের পাশ থেকে সেই প্যাকেট তুলে অনভ্যাসের একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর মৃদু শব্দে একটু কাশে।

সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সানাই বেজেছে, বেজেছে উলুধ্বনি, হাসি, নানা শব্দ। সন্ধ্যারাতে ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। এখন রাত গভীর। ছাদের ওপর ঘুম ভেঙে বসে আছে পরাগ। মাথার ওপর ছাদের ত্রিপলের একটা কোণ উড়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীচে এঁটো পাতা নিয়ে ঘেয়ো কুকুরদের গম্ভীর ঝগড়ার আওয়াজ।

পরাগ অপলক চোখে অথৈ আকাশটুকু দেখে। এ রকম মধ্যরাত্রির আকাশ এমন বিরলে সে আর কখনো দেখেনি। আজকাল আর হইচই ভাল লাগে না তার, তাই শোওয়ার সময়ে সে একটা চেয়ারের গদি আর কম্বল টেনে নিয়ে এসে ছাদে শুয়েছিল।

এখন বুঝতে পারে, এই ভয়ঙ্কর শীতে আর ঘুম আসবে না। সে বসে থেকে সিগারেট খায়, আর অপলক শূন্য চোখে আকাশ দেখতে থাকে।

কোথায় যেন একটা কাশির আওয়াজ হয়, নাল-পরানো জুতোর আওয়াজ, মাটিতে লাঠি ঠুকবার শব্দ। পরাগ উঠে ছাদের আলসের ধারে আসে। অন্ধকারে ঝুঁকে দেখে, মুনিয়াদের বাইরের বারান্দার অন্ধকারে কে যেন বসে আছে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। লোকটা সিগারেট ধরায়।

পরাগ ডাকে—কাকাবাবু।

—উঁ। সুবিনয় উত্তর দেয়।

—এখনো শোননি। রাত দুটো বেজে গেছে।

সুবিনয় গলার মাফলারটা ভালো করে জড়ায়, পায়ের মোজাটা একটু টেনে তোলে। তারপর বলে—ঘুম আসে না।

হাতের টর্চটা জ্বেলে চারদিক একবার দেখে নেয় সুবিনয়, তারপর বলে—তুমি ঘুমোওনি?

—আমি ছাদে শুয়েছিলাম, কিন্তু এখানে বড় শীত। ঘুম আসছে না।

—হুঁ। এবারে শীতটা খুব পড়ল।

বাতাসে ত্রিপলের কোণটা উড়ে ফটাস ফটাস শব্দ করে। তারা কেউ চমকায় না।

পরাগ চাপা গলায় বলে—এই অন্ধকারে কি আর খুঁজে পাবেন? এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—যাই। উত্তর দেয় সুবিনয়, কিন্তু ওঠে না। বসে থাকে।

মুনিয়া মারা গেছে এক মাস। প্রায় এক মাস ধরে সারা দিন সুবিনয় শাবল আর লাঠি হাতে বাগানে ঘুরছে। খুঁড়েছে গাছের তলা, মাটির ঢিপি, ইঁদুর আর ছুঁতোর গর্ত। প্রথম প্রথম সঙ্গে পরাগ থাকত, থাকত পাড়ার উৎসাহী ছেলেমেয়েরা, যারা ভালবাসত মুনিয়াকে। ক্রমে ক্রমে সবাই যে যার কাজে ফিরে গেছে। এখন একা সুবিনয় সারাদিন সাপটাকে খোঁজে। গভীর রাত পর্যন্ত। আজকাল বড় একটা ঘুম আসে না।

পরাগ আর কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নেমে আসে। বারান্দা থেকে পাখিটা তীব্রস্বরে ডাকে—'পরাগ'। পরাগ নেমে আসে, সদর খুলে বেরোয়।

—কাকাবাবু এই নিন এক প্যাকেট সিগারেট। আপনার জন্য রেখেছিলাম!

খুশি হয় সুবিনয়। হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বলে—মুনিয়া বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম, বুঝতে পরাগ! মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম।

শীত বাতাস বয়ে যায়।

—এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। শীতকাল—এখন সাপেরা বড় একটা বেরোয় না।

—তাই হবে। সুবিনয় বলে বসে থাকে। তারপর বলে—তুমি যাও। আমি আর একটু দেখে গিয়ে শুয়ে পড়ব। যতক্ষণ ওটা আছে ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাই না।

পরাগ ওঠে। খুব শীত বলেই কিনা কে জানে তার চোখে জল আসতে থাকে।

একা আরো কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকে সুবিনয়। তারপর টর্চবাতিটা জ্বালে।

ব্যাটারির জোর কমে গেছে, আলোটা লালচে। টর্চটা ঘুরিয়ে সামনের মাঠটা একটু দেখে, বাগানের বেড়ার ধারে যায়। লেবুগাছ আর ডালিমগাছের গোড়া থেকে আলো সরিয়ে নেয়। দত্তদের বাড়ি উঠছে, তাদের ইটের পাঁজাটা দেখে সুবিনয় পথে নামে। পরাগদের বাড়ির সামনে ঘেয়ো কুকুরদের ভিড়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বন্ধ ডাক্তারখানার চাতালে একজন মাতাল বসে আছে। সুবিনয় এগোয়। পুলিশ-ব্যারাকের পিছনের দেয়ালের সামনে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে মোমবাতি, আলকাতরার টিন, তুলি। কী লিখছে!

টর্চের আলো ফেলে সুবিনয় দাঁড়াতেই ছেলেগুলো রুখে মুখ ফেরায়।

—কে?

এ পাড়ারই ছেলে। তাকে চিনতে পারে। একজন এগিয়ে এসে বলে—আমরা কাকাবাবু। আপনি কী খুঁজছেন—সেই সাপটাকে? ওটাকে কি আর পাবেন। বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবিনয় টর্চের আলো ফেলে দেয়ালে, বলে—এসব কী লিখছ?

—তেমন কিছু না। আপনি বাড়ি যান কাকাবাবু। আমরা লিখি।

সুবিনয় লেখাগুলো পড়ে! ঠিকঠাক কিছু বুঝতে পারে না।

—লিখছো! আচ্ছা লেখো। বলে সুবিনয় আবার এগোয়। রেলরাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। আবার ফিরে আসে। চারদিকেই অন্ধকার, নির্জনতা।

দিন কেটে যায়।

তখনো অন্ধকার ঝুলে আছে চারদিকে, ভোর রাত্রে পরাগের চন্দনা পাখিটা ডাক দেয়—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগের আলস্যজড়িত ঘুম ভাঙে। উঠতে ইচ্ছে করে না। পাখিটা ডাকে, ডাকতেই থাকে। বিরক্ত পরাগ পাশ ফিরে ধমক দেয়—এই, চুপ!

পাখিটা ডানা ঝাপটায়, কিন্তু আবার ডাকে, পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

উঠতে ইচ্ছে করে না। সকালের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটি আর দেখা যায় না। মুনিয়াদের বাগানে মুনিয়া। কী হবে বড় হয়ে আর? পরাগের আর বড় হতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতরে এক গ্রীষ্মের প্রান্তরে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যায়।

পরাগ পাশ ফিরে শোয়। সিগারেটে এখন আর অভ্যাস হয়ে গেছে। বালিশের পাশেই থাকে প্যাকেট। সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খায়। কিন্তু পাখিটা ডাকাতেই থাকে—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগ চুপ করে থাকে। একবার ভাবে, উঠব না—খেলোয়াড় হয়ে আমার কী হবে! আর একবার ভাবে, উঠি। ভাবতে ভাবতে তার শীত করে। লেপটা মুড়িসুড়ি দিয়ে শোয়। মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না। তাই শুয়ে সিগারেট টানে পরাগ! এর অনিয়ম দেখে তার চন্দনা পাখিটা রেগে গিয়ে ডানা ঝাপটায় আর ডাকে। ডানা ঝাপটায় আর ডাকে।

হঠাৎ মাথার ভিতরে একটি ঘন সবুজ মাঠের দৃশ্য ফুটে ওঠে। উঁচুতে একটা সাদা বল। সেই বলের দিকে লাফিয়ে উঠছে কয়েকজন লাল-সোনালি নীল-লাল জার্সি পরা

খেলোয়াড়। হঠাৎ উষ্ণ একটা রক্তস্রোতে পরাগের শরীর ভেসে যায়। এ বছর পরাগকে ডেকেছে কলকাতার বড় একটা ফুটবল ক্লাব।

ভাবতে ভাবতে পরাগের শরীর চনমন করে। সে উষ্ণস্রোত তার শরীরের শীতভাব দূর করে দেয়। সে উঠে তার শর্টস পরে, পরে নেয় কেডস্, তার পাখিটি চুপ করে দেখে। খুশি হয়।

মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াদের দেখা যাবে না।

পরাগ এ বছর কলকাতার বড় একটা ক্লাবে খেলবে।

ভোরবেলা বহু দূরে এক কারখানার ভোঁ বাজতে থাকে।

সুবিনয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রমলা একটা সেলাই মেশিন কিনবে। দুজনের চলে যাবে কোনোক্রমে। সারাদিন এবং রাত পর্যন্ত সাপটাকে খোঁজে সুবিনয়। ঘুম আসে ভোর রাত্রে।

দাড়িওয়ালা, স্মিতমুখ কার্ল মার্কসের ছবিখানা এখনো তার শিয়রে টাঙানো, মাঝে মাঝে সে ঘুম-জড়ানো চোখে ছবিখানার দিকে চায়। অস্ফুট গলায় বলে—আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতুম আমার মুনিয়াকে। আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়। আমার এ অপরাধ ক্ষমা কোরো।

ক্রমে কার্ল মার্কসের ছবিখানায় ধুলো পড়ে। এক দুঃসাহসিক মাকড়সা লাফ দিয়ে উঠে আসে, তারপর স্মিতহাস্যময় সেই মুখের ওপর তার অমোঘ জালখানা বুনতে শুরু করে।

নীলুর দুঃখ

সক্কালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিক্‌রমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলে বুঝি ঐ প্রসন্নতা—ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা—বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল, বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রানাকে পাঠিয়েছিল কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিক্‌রমবাজি। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেত—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষ দিকে টাকা ফুরোলেই টিক্‌রমবাজি শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামী, ছেলে, ছেলের বউ—চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসি বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, আইবুড়া নিবারণ কাকা—বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার! বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুম হাম করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছনে পিছনে। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উল্টোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি।

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান।

—ফের! কষাবো আর একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকোনো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে—একডিন ফুটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে! কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তাই সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভাল করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিগ্যেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আব্বে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আর অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল বৃটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল!

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বউ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বৃটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল বৃটিশ—ঈ-ঈ-ঈদ্ কা চাঁ-আ-

আ-দ্! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট্-ফটাস করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেরালী, কাঠবেরালী, পেয়ারা তুমি খাও.....' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীল, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বৃটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিগ্যেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে বৃটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আব্বে, পঞ্চা-আ-শ হা-জার-আ-র। জাপান আরো দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু' হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারো। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল বৃটিশ—তিনশো, মাইরি বলছি বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ' দুয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বৃটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বৃটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে দিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বৃটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে, সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বৃটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বৃটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। ব্রিটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে বৃটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,—না-হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র দুটো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেন্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে বৃটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটি বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তার একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন,

বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে, বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলে-ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডিজ সিটে দু-তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দু-চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উল্টো-পাল্টা কথা, গানের বলি। কন্ডাক্টর দুজন দু'দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই!

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে—পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত করে?

—আমাদের হাফ-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না-কামানো কয়েকদিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হেডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

—ট্রাফিক সিগন্যাল বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ! নিরোধটা কি যেন।

—রাজার টুপি....রাজার টুপি....

—খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা....

—খ্যা....

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে....লেডিজ....

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কন্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটা খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে

মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্জারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো, বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশি বারো-ছবিওলা ক্যালেন্ডার, মেঝেয় কয়ের কার্পেট। মাঝখানে নিচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশ-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝেয় ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসেছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু' কোলে তুলে নিয়ে ভারি একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলি জুলি তার চুল, জামার কলার লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে।

—এইবার চড়বে। বাজার এলো এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুরে। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, খুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ঐ ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

—যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাত না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাব-যাব করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বাঃ, মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারো তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছ।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে? তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

—শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা। তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদের তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা।

—কী লিখেছে?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রং করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রং দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো।

—কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবন্ডস্, মিসফিট্স, প্যারাসাইট্স্...আরো কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি! শেষমেশ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম—ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোব না? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যাম্ফ্লেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল—কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোক এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল—বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছজন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে—খাওয়ালে না কি?

বল্লরী কথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াবো না কেন?

—সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল—আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে—ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝব!

—তুমি ঠিকই বুঝেছ। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছ!

—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ' পেয়ালা চা করতে কতক্ষক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশি হল! বলল—বৌদি দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভাল না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থম থম মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দূর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল

প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন এইসব লেখা দেখেছ নীলু। কী রকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছ কীরকম উল্টো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন—হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, অপরটা মার্কসের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এ সব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো। পথ-চলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়! নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িসনি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। ফিরে আসবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিগ্যেস করতে চায়—দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে

আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দে কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামী কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরো বেশি। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক্ পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামী, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ্য করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খঠাখট্ পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখানকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দুটো বড় কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামী টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে-মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ঐ দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহিদ স্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরে-ফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরো দুদিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসিমুখেই মেনে

নেবে নীলু, নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তার টুকরো ঝরে-পড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস?

পোগো দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল!

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারব না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না— সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ্। মাথার নিচে হাত, হাতের নিচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভাল নেই সেদিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বউ অঞ্জলিকে। খুব ভিড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা-জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নিচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে, পিছনের মানুষরা নামবার জন্য অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে কোনোদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি করে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাশুদ্ধু অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভিড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে-এ। নামো শিগগির নামো, বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিসফিসের মতো শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কন্ডাক্টর ডবল ঘন্টি বাজিয়ে দিচ্ছে....অঞ্জলির কী যে হবে!

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বউ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন চলে যায় তখন তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখেনি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয়নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তাছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটো বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করেনি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে

এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরত দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোটো বোনের বিয়ে আর দু'মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই কটা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়ব না।

অঞ্জলি ফেরত গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু'মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি নড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন'মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে অঞ্জলির কথা সে এখনো ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই দুটো ক্লাশ। একটা সেকেন্ড পিরিয়ডে নিয়েছে, আর একটা ফিফথ্ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি. ইউ-তে এখনো ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে গেছে। সপ্তাহে দু'দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাশ নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভাল না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু-আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ঐ ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ঐ দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফ্থ পিরিয়ডের ক্লাশটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরের একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশুশরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড় জোচ্চুরি যে টেকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ঐ কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারাজীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু'মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্ম লাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কি না কে জানে!

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে ঘাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের আভ্যন্তরীণ ময়লায়, ক্বাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভিড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচায়। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে—কোথায় যাবেন।

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—সোজা চলুন বলে দেবো।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম। এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েকমাস সেই বই প্রায় ছোঁয়নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘোরালো সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরে-ফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধহয় ভালই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গীর কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামী বিদেশি গাড়ি এধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কী রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ'মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাঁকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পা-দানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্ন দেখার কোনো মানে না থাক্, গত ছ'মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্যি। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এইভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু

তবু অসুখীই থেকে যাবে মন্দার। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলিকে দেখতে ভাল, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রং চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিগ্যেস করেছিল—তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল, আমার বাবা এই বিয়ে জোর করে দিয়েছেন, আমি চাইনি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কিনা বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস্!

অঞ্জলি তবু কাঁদেনি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধহয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সরে-যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর, অন্যমনে বসে ভাঁড়টা শেষ করে।অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাস ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার...

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, একটা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জলুশ নেই। রং ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো!

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোনো দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমার এখন অফ্ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাশটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

—মনে করলেই ছুটি।

—কোথায় যাবে?

—আমি কি জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বউ। এত চালু মন্দার ভাবেনি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ্য করেনি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়ে ছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শকাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে বলল—আমার চারটেয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ থাক। কোনো দিন আসব।

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না কেন?

—আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড়

এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পা-দানি, ভিড়, টাল-মাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল! ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বউ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

—বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিগ্যেস করে—কী খবর?

—খবর আর কী? কোনোরকম। বুড়ো গলা খাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিগ্যেস করেন—কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁ দিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কি না কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিগ্যেস করে—কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভাল আছ?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ঐ চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে।

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড় করে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক?

—ঐ বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী করে হল?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসেনি? তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়ে! ভারি অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তাছাড়া আমি তা করতে যাব কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছ।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

—যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

—আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরি কী একটা বলার আছে তার। বুঝতে পারছ না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েকমাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কি হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছ, তোমাকে কেউ আদর-যত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুণি নিজের ভুল সংশোধন করে বলে—অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিগ্যেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভাল আর কি। আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর! একটা খারাপ হলে আর একটা ভাল হবে কী করে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন! মন্দার চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো না কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিগ্যেস করল—এ সব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—তা জেনে কী হবে?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছ, কিন্তু পারছ না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভাল হত বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—মন্দার!

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারি অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই....

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—নিজেই করলেন?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

—আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বলে বুড়োমানুষ ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে মন্দার এবাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নিচু করে বলে—আচ্ছা, তাহলে বরং থাক্।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়ে ছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেজ থেকে এলে তো?

—হুঁ।

—খিদে পায়নি?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মতো মন্দারের দিকে চেয়ে থাকে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়! তারা একটুও আশা করেনি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিসটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার তুলে ফেলা ভারি মুশকিল।

মন্দার উত্তর দেয় না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে—বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারিনি। স্বামী জিনিসটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই। এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলি সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়...অঞ্জলি চুপ করে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কি একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুব জরুরি।

—বলো।

—বললাম তো মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু-আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো? অঞ্জলি আচমকা জিগ্যেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

—তুমি আমার ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার। আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয়নি!

—কী শোধ নেবে বলো?

—কি জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কী কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কীরকম দুঃস্বপ্ন?

—ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ করে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডবলডেকারে পা-দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌঁছোতে পারছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়তো শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাবো। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোনো, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব, এরকম বসে থাকব একটু দূরে, কথা বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করব! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কী ভীষণ ভালো লাগছে!

—আসব। কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

—এসো। যখন খুশি।

—আসব। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভাল থেক, সাবধান থেক।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারিদিকে বিশ্রী মানুষ-জন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে চারিদিকে বিপদ।

—কী বলছ?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে! আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না!

—তুমি কী বলছ?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি! একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোনো লাভ নেই! সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে তার কোনো ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে?

গঞ্জের মানুষ

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হিরে-জহরত সব ঐ ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেল লাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছ-গাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনো ফেরেনি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ-গাড়িতেও আসেনি। আরো খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তা-ভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাৎ নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হোক্কাড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় খায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা, সিঁথেয় সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই নদীয়ার বউকে ভয় পায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না, চোখে হাত আড়াল দিয়ে বুঝে ভয়ে ভয়ে বলে—কে, নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছো?

—বাজারের দিকেই।

—চলো, একসঙ্গে যাই।

—চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন্ শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ঐ সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনঅলা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ঐ চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু'দুটো মন্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু'বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ঐ একটাই মিষ্টির দোকান। আরো কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল—সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছ? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছ কখনো মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, তবু মাঝে মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু' চারটে হিন্দী কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল—নদীয়া ভাই, আউরাৎ তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মৎ।

—তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগ্‌নার মজা দেখছ।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল—ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল—এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভাল জুতিই নেই। ঐরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হাওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়!

—রাখো রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে—শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিল, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহ্লাদ আসে মনে। এত আহ্লাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনো বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিসকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী। ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সব সময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মসলাপাতি, মনোহারী জিনিস, পাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে

লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভাল লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু'পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এ সব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কী বা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারি ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনো সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটানো দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে না হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাধায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায় ঘেন্নায় শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশা-ভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগারপাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুর ঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিসেও খোঁজখবর করছে। বড় অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝেসমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানী মন্ত্র। মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সেও মাগনা নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি মিনতিতে আজকাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালেও না। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারাম বাপকে দূর-দূর করে। একটা বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটিকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু'পাঁচ টাকা ঐ বাপ কি ছেলেই ছুড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মসলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু'চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড় ভাল। সারাদিন বসে কী যেন ভাবে। লোকে বলে গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ঐ শ্রীপতি মাস্টার তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু'ঘন্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ঐ দু'ঘন্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

—রাম রাম মাস্টারজী। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গোঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ্?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে এসে সে বড় বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত্ হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলাদেশ থেকে আর বাঙালির সঙ্গে কারবার করে করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় খেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজী। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকী সে যে এত ভাল হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে। আর যা সব জ্ঞান আছে তার, সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারী করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দু'বার ঠেক্ খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরেই চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম

বি-কম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বি-কম হওয়া যায়।

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাবো।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজী?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে! বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই! খেলারামেরও না হোক বাইশ চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এই গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপর শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে এই গতিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত!

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁঝবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তাছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভাল করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরীর চাপানের মতো আর কি আছে! না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারী বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝাঁ চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি না-দেখি না ভাব করে ব্যাপারীর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময় হাতছিপ্পু করে দু' প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেই সঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সব্জীবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সব্জীওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখনো বেশ খানিকটা দূরে। নদীয়া ডানপায়ের চটিটা তুলে সব্জীওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলী দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিঁড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্ধেক। আর এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারি দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

চামার সীতারামের দোকানটা সব্জী বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভাল। একধারে লোহার আড়ৎ, অন্য ধারে ভুসিমালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নিচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচীর দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোট চৌখুপীটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথাও ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয় বসে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনো গর্তের ভিতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ত জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খস্‌খস্‌ করে দু'চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কি না।

নদীয়াকুমার ভাল খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখমাঙ্গাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটো সুতোর টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলে—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না

কোনোদিন। খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল— দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু, জুতো মাথায় মুখে লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কি, লেগেছে। বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এনে ভুস্‌ভুসে রবার ফুটো করতে করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নিচু করতে জানে না তো, তাই ঐ সব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

—এঃ ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। মাথাটা টেরিকাটা পুরুষমানুষে চুল, পরনে পাঞ্জাবি ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষীর চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নদীয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভাল দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিলে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলে মুঠি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পড়শীরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ঐ যে খড়কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনো ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল।

এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া এক পলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু! মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নিব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্ত বমি হয়ে মরবি যে।

ফস্ করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কি! হবে।

—হবে? ভারি অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাতে চালিয়ে দেয়।

—আলবাৎ হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়! তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই!

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ঐ যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম কখনো উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ঐ শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনোদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরদা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারি দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভাল করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কি গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও নাকি? খবরদার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ঐ কুকুরে-খাওয়া চটি ভদ্রলোক পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারি জুতো।

চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা। রংটাও ভাল। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবে-চিন্তেই বলে। কারণ সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? না কি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোকা চটে লাভ কী! ভালমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তা বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্চে এক সাইজ ছোটো কিনে ফেলেছি! বেদম টাইট হচ্চে। দেখ তো, তোমার পায়ে লাগে কিনা—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কি! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল। নাও তো পরে দেখ! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেবো। ত্রিশ টাকায় কেনা, তা সে কত টাকা জলে যায়। পরে দেখ।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে—ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেও না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্পশু-র মতোই। কিন্তু ঠিক পাম্পশু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখলে নদীয়া।

আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে পায়ে বড় কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তাছাড়া পাথরকুচির রাস্তায়, অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দুখানা ঘরবন্দী হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে—বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটোলোকী পায়ে কি আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও! আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেব। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহাড় নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বললে—টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া—

—আরে না না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে— সে বড় শক্ত জিনিস। তোমরা

পায়ে দিলে ফোস্কা পড়ে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ-বিশ টাকা দিয়ে দিও, তোমার ধর্মে যা সয়।

সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে—ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত কোথাকার! দশ-বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে। তারপর খুব ধীরে বলে—তোমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠান্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কি রকম ধারা রুগী তুমি? দুনিয়ার কত কি আরামের জিনিস চমকাচ্ছে,—তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছো।

নদীয়া না, না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কি! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে। নিজে রোজগার করতে নেমে আর পরেনি। নি। বলল—দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে!

—দশ কী বলছ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিও। সেও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোটো হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনো বাজার ঘুরলে বিশ-পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

বারো টাকা দেব। ঐ শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে—বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা!

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে? নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকোনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কি না কে জানে, নদীয়ার কোনো কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতোজোড়া দেখে নেয়। মিটমিটিয়ে হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা.....ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল। এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ-তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায় তেমনি মাস্টারজীকে ভয় খায় খেলা। মাস্টারজী সটাং ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে, কষাকষ হিন্দী বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারি বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো।

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদিতে বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে। শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারে কুয়াশায় নেমে গেল! তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে আসতেই শুনল, দাদু ফেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে—কোথায় সারাটা দিন লেগেছিল চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে বসে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা!

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে; বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছো-বাজার পেরোবার সময়ে। তখনো কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এইসব লোকেরা শেলী কীটস্ পড়েনি। শেক্সপীয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য, তবু বেশ বেঁচে-বর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন—ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ঐ ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফকিরচাঁদের ঢিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনো মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বইয়ের জগতের তালেবর লোক। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কি একটা খাঁকতি

থেকেই যাচ্ছে। সে কি ঐ উপলব্ধি বা দর্শনের?

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎস্না মাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল। হচ্ছে না। মনের পর্দায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হল্লা-চিল্লা করতে করতে কাছে এসে পড়ল। সব কটা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল—রাম রাম মাস্টারজী, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নিচু-নজরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওয়া ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি—

—আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজী? আমার বাপকে আর কেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতরো হয়ে গেছি। ভাল লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছোঁক নেওয়ার নেই। পুঁথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজী। ফকিরচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হিরে জহরত একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ ব্যাঙ আর ইট পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাপারের তলায় বগলসই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধহয় নদীয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশার জ্যোৎস্নায় যেন দুধে-মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোয় শীত সেঁধাচ্ছে। বাবাকেলে তুষের চাদরটায় মাথামুখে ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে কারা যেন গোপনে কি সব করছে। দুচারটে ছায়া ছায়া লোকজন দেখা গেল। নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে মাঝে নতুন জুতোজোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুকফাক করে সুখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিন দশ বাদ দিয়ে

পড়বে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরোটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল, তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত। তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে?

নদীয়া বলে—রাম রাম কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে— কে আমি?

—আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, ঊর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওলা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী!

—তোমার এই সাজ? ভারি অবাক হয় নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে — কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনিকে পছন্দ করে এসেছ, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থাপন করবে—তাতে বুঝি ছাই দিলাম। ঝ্যাঁটা মারি—

এই সব বলতে বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহীন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে, নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী। এই রকমই অশান্তি করত।

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে—কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দীকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে—আমি এখন চুল পাবো কোথায়! কত লম্বা চুল ছিল আমার! তুমি কি এখন আর আমাকে ভালবাসবে চুল ছাড়া!

—দূর মাগী! নদীয়া আদর করে বলে—চুলে কি যায় আসে!

ভোররাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসী বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরো। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাতাড়ি কোদাল, গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প অল্প মাটি সরে আর বস্তুটা বেরোয়। কি এটা?

অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে ঘড়া বা কলসী নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস। ফকিরচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়ে ছিল এইখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনো কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম!

খেলা দুলে দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা বোধহয় ভদ্রলোক হবে একটা!

ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

ঘণ্টাধ্বনি

সাঁঝবেলাতে গোয়ালঘরে ধুনো দিতে গিয়ে কালিদাসী শুনতে পেল রামমন্দিরে খুব তেজালো কাঁসি বাজছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

গুন্টু দুপুর থেকে বাড়ি নেই। আলায় বালায় সারাদিন ঘোরে। মাথা-গরম ছেলে। যখন তখন হাফ-পেন্টুল খুলে পুকুর ঝাঁপায়। চৌপর দিন জলে দাপাদাপি করে। কবে জলের ঠাকুর টেনে নেয় ছেলেটাকে। তবে ভরসা এই, গুন্টুর প্রাণে ভক্তি আছে। সন্ধে হলেই রামমন্দিরে গিয়ে বুড়ো বাজনদার আফিংখোর গোবিন্দর হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে নেচে নেচে বাজায়। ঐ বাজাচ্ছে এখন। কাঁইনানা কাঁইনানা।

কেলে গরুটার নাম শান্তি। ভারি নেই-আঁকড়া। কালিদাসীকে পেয়ে গলা এগিয়ে দিল। ভাবখানা—একটু চুলকে দাও। তা কালিদাসী খানিকক্ষণ তুলতুলে কম্বলের মতো গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিতে থাকে। অন্য গরু শিপ্রা ফোঁসফাঁস করতে থাকে। শিং নাড়া দেয়; কালিদাসী বলে—রোসো মা তোমাকেও দিচ্ছি। এ মুখপুড়ীর আর কিছুতেই আরাম ফুরোয় না।

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের এই সময়ে প্রায়দিনই ভাব হত। ভাব হলে হাত-পা টানা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে মুখে গাঁজলা তুলে নানা কথা বলত। সে সব কথা স্বয়ং ভগবানের। একবার কালিদাসীকে বলেছিল—ও কালী, ভুরের পায়েস খাব, এনে দিবি?

তা ভুরে গুড় দিয়েছিল কালিদাসী? একটু আধটু নয়, আধ মণেরও বেশি হবে। তাই দিয়ে সেবার বিরাট পায়েস ভোগ লাগানো হল মন্দিরে।

চক্কোত্তিমশাই এখন বয়সে পঙ্গু হয়ে টিনের চারচালায় দাওয়ায় চৌকি পেতে বসে থাকে দিন রাত। তামাক খায়। সেজো ছেলে মনোরঞ্জন এখ· মন্দিরের সেবাইত। কালীদাসীর এখন আর যাওয়ার সময় হয় না। প্রায়ই ভাবে একদিন গিয়ে বসে আরতি দেখবে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার গোয়ালঘরে কালিদাসীর ভাল করে ঠাহর হয় না কিছু। টেমি হাতে এগিয়ে গিয়ে খড়ের গাদা গোছ করতে হাত বাড়িয়েই মধ্যের আঙুলে কাঁকড়াবিছের হুল খেয়ে উঃহুঃ করে ওঠে।

ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম কাঁকড়াবিছের হুল খেয়েছিল কালিদাসী তখন যন্ত্রণার চোটে সে কি দাপাদাপি! হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে বিষ ব্যথা থানা গেড়ে ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে।

তারপর মাসটাক যেতে না যেতে ফের একদিন হুল দিল। আবার দাপাদাপি আবার হাসপাতাল। কিন্তু কাঁকড়াবিছেরা কালিদাসীকে সেই থেকে কেমন যে পেয়ে বসল। কাছে পেলেই হুল দেয়। এই ত্রিশ বছর ধরে মাসে দু-তিনবার দিচ্ছে। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন, তেমন লাগে না।

কালিদাসী টেমি রেখে খানিক কাঁচা গোবর বাঁ হাতের মাঝের আঙুলটায় বসাল ঠিক যেমন গোলাপগাছের কলমচারার ডগায় লোকে গোবরের ঢিবলি দেয়।

কালিদাসীর শরীরটা কাঁকড়াবিছের বিষে ভরে গেছে। এখন বিষে বিষক্ষয় হয়ে যায়।

আশ্চর্য এই বাচ্চা দেওয়ার সময় মেনী বেড়ালটা গোয়ালঘরে এসে ঐ খড়ের গাদায় বাসা বাঁধে। ফুলি কুকুরটা তো ফি বছর খড়ের মাচার নিচে গর্ত করে চার-পাঁচটা ছানা বিয়োয়। গরু দুটো সম্বচ্ছর এই ঘরে রাত কাটায়। এগুলোকে কেনোদিন হুল দেয়নি পোড়ারমুখোরা। মানুষের ওপর যত ওদের রাগ। আর মানুষের মধ্যে আবার সবচেয়ে ঘেন্নার হল ওদের কালিদাসী হতভাগী।

আঙুলে-গোবরে করে টেমি হাতে কালিদাসী গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের কপাটটা টেনে দিতে দিতে আপন মনে বকবক করছিল—ঝ্যাঁটাখেকো, কেলেঘেন্না, খালভরাগুলো কোথাকার! কালিদাসীর কাছে বড় জো পেয়েছিস।

নিচের তলার নতুন ভাড়াটে হেম ঘোষ, নতুন বিয়ে করেই মা-বাপ-ভাই ছেড়ে আলাদা বাসা করে উঠে এসেছে। তার বউ রেবা নাকি বড়ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম করতে পারবে না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে থাকত বলে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে পড়ল। হেম ঘোষ বউয়ের পক্ষে। বাড়ি ছেড়ে উঠে এল। চাকরি তার তেমন কিছু নয়। দাশনগরে এক তালা তৈরির কারখানায় চাবির খাঁজ কাটে! ত্রিশ টাকার ঘর ভাড়াও দুমাস বাকি ফেলেছে। তবু বউয়ের সুবিধার জন্য সব সময়ে কাজ করার বাচ্চা ঝি বহাল করেছে, তার ওপর ঠিকে কাজের লোক তো আছেই।

দাওয়ায় বসে লুঙ্গি পরে হেম বিড়ি খাচ্ছিল। কালিদাসীর বকবকানি শুনে বলল—কি হল দিদিমা? কাঁকড়াবিছে কামড়াল বুঝি?

কালিদাসী বলল—তা কামড়াবে না কেন বাবা? কালিদাসী যে ভাল-মানুষের মেয়ে হয়ে শতেক পাপ করেছে।

হেম ঘোষ বিড়িটা ফেলে একটু তটস্থ হয়ে বলে—এ তো বড় মুশকিলের কথা হল দিদিমা। এ বাড়িতে বড্ড দেখছি কাঁকড়াবিছের উৎপাত। রেবাকে যদি কামড়ায় তো রক্ষে নেই।

কালিদাসী মনে মনে বলে—বউকে তাহমহলে নিয়ে গিয়ে রাখো গে যাও। দেখালে বটে তোমরা বাপ! আজকালকার রত্তি মেয়েরা কি করে যে গোটাগুটি পুরুষ মানুষগুলোকে হজম করে বসে থাকে!

ওপরের বারান্দায় উঠে আসতে আসতে কালিদাসী ফের মন্দিরের শব্দ শোনে। গুন্টু কাঁসি বাজাচ্ছে। কাঁইনানা, কাঁইনানা।

টেমি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় কালিদাসী। বুড়ো বয়সের ভুল। মন্দার না বারান্দায় বসে উনুন সাজাচ্ছে, এক্ষুনি দেশলাই চাইবে! টেমিটা না নেবালে দেশলাইয়ের কাঠি বাঁচত। ছাদে গিয়ে উনুন ধরাতে মন্দার মা না হোক চার পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবে।

এ সবই কালিদাসীর জ্বালা। সংসারে আছে এক উড়নচণ্ডি ছেলে, আর মেয়ের ঘরের নাতি ঐ গুন্টু। তবু সংসারের হাজার চিন্তায় কালিদাসীর ডুবজল।

২

কানাই মাস্টারের আজ সারাদিন বড় হতভম্ব লাগছে।

এমনিতে কানাই বড় নিরীহ লোক। তিন বছর হল তার দশ বছর বয়সী ছেলেটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রায়। শরীরে সব কটা হাড়ের জোরে বিষযন্ত্রণা। হাঁটু, কনুই, কব্জি সব ফুলে আছে। শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঠারেঠোরে বলেছে, ভাল হওয়ার রোগ নয়।

কানাই মাস্টারের একটাই ছেলে, আর মেয়ে দুটো। তার নিজের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু এ বয়সেই বড় বুড়োটে মেরে গেছে কানাই। ছেলের চিন্তা উদয়াস্ত ভিতরটা কুরে খায়। তার ওপর কটা টিউশনি করে রসকষ আরো মরে যাচ্ছে ক্রমে।

আজ হল কি, ইস্কুলের আট ক্লাসে থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নিচ্ছে। মদন নামে ধেড়ে ছেলে আছে একটা। তার গলায় আবার কালো তাগায় বাঁধা রুপোর তক্তি। রাঙামুলো চেহারা। কোনোকালে পড়াশুনোর ধার মাড়ায় না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুভ দৃষ্টির সময়ে নববধূ যেমন চোখ নামায় তেমনি নতচোখে চেয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার বাপ বড় কারবারি, তাই মাসকাবারে ইস্কুলের বেতন কখনো বাকি পড়ে না। সেই কারণে কেউ বড় একটা ঘাঁটায়ও না মদনকে। আছো মদন, থাকো মদন গোছের ভাব করে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়। প্রতি ক্লাসে তিন-চার বছর করে থাকলে মদনের বাবদ ইস্কুলের একটা স্থায়ী আয় তো বহাল রইল। এমনিতে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ষাট সত্তরজনই ডিফলটার। কারো সাত-আট মাসের বেতন বাকি পড়ে আছে। ধমক চমক করলে গারজিয়ানরা এসে হেডস্যারের হাতে পায়ে ধরে। সেই সব গারজিয়ানরাও 'দিন আনি, দিন খাই' গোছের। কেউ বিড়ি বাঁধে, কারো তেলেভাজার দোকান, একজন গামছা ফিরি করে ময়দানে। এই রকম সব। তাদের মধ্যে মদনের বাবা হচ্ছে নৈবেদ্যর কলা।

মদনা ক্লাস এইটে পড়লেও তো আর ছেলেমানুষ নয়। বয়সের ডাক দিয়েছে। শরীর জাম্বুবানের মতো বড়সড়।

বয়সের দোষই হবে। রোজই ইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে বীণাপাণি ইস্কুলের মেয়েরা যায়। ইস্কুলের বড় ক্লাসের ধেড়ে ছেলেরা এই সময়টুকুতে রাস্তার মোড়ে, সামনের বারান্দায়, পাশের মাঠে জমে থাকে। কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট টানে, কেউ সাইকেলে করে বোঁ চক্কর মারে। যার যা আছে সব দেখায় মেয়েদের। হাসি-টাসি তো আছেই। ছেলেদের এইসব বোকামি দেখে মেয়েদের কেউ কেউ হাসিতে ঢলাঢলি করে যায়, কেউ গম্ভীর মুখে দৌড়ে-হেঁটে পালায়, দু-একজন 'জুতো-মারব, লাথি মারব' গোছের কথা বলে শাসিয়েও গেছে। নিত্যকার ঘটনা, কারো গায়ে লাগে না। আজ হল কি, থার্ড পিরিয়ডে যখন কানাই ক্লাস নিচ্ছে তখন টুকটুক করে একটা ফুটফুটে বছর দশেকের মেয়ে সোজা সরল পায়ে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পাখির কণ্ঠে বলল, মাস্টারমশাই!

কানাই অবাক। মেয়েটার পরনে ইস্কুলের সাদা ইউনিফর্ম। হাঁটু পর্যন্ত বাহারি মোজা। মুখচোখে ভারি তিরতিরে সুন্দর।

কানাই মাস্টার মুগ্ধ হয়ে বলল, এসো মা। কী হয়েছে বলো তো?

মেয়েটা ক্লাসে ঢুকে একটা ভাঁজকরা কাগজ কানাইয়ের সামনের টেবিলে রেখে বলল, মাস্টারমশাই একটা দুষ্টু ছেলে আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় আমার হাতে এটা দিয়ে বলল, এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পোড়ো। কী সব বাজে কথা লেখা আছে দেখুন। ঐ ছেলেটা। বলে মেয়েটি মদনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

কানাই চিঠিটা খুলে দেখে তাতে লেখা— প্রীয়তম রোজী আমি তোমাকে ভালবাসে। আমায় মোনের কথা তুমি কী বুঝিতে পারো না? কিস জানিবে। তোমার প্রীয় মদন।

চিঠির ওপর শ্রীকালী লিখতেও ভুল হয়নি।

কানাই দুটো কারণে চটে গিয়েছিল। এক তো মেয়েদের চিঠি দেওয়া সাংঘাতিক বেয়াদবি। তার ওপর এইটুকু একটা চিঠিতে এতগুলো বানান ভুল!

—তুমি এসো মা, আমি দেখছি। এই বলে কানাইমাস্টার রোজিকে বিদায় করে মদনকে ডাকল। যখন ডাকল তখনই একটা বেসামাল রাগ পেটের ভিতর থেকে উঠে আসছিল তার। সেই রাগে হাত থরথর করে কাঁপে, মাথাটা ঘোলা লাগে, দাঁতে দাঁতে বাতাসা পেষাই হয়।

মদন কাছে আসতেই বিনা প্রশ্নে প্রথমে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠক করে টেবিলে ঠুকে দিল কানাই। সেই সঙ্গে পিঠে যত জোরে সম্ভব এক কিল। বোঝা গেল মদনের চেহারাটা বড়সড় হলেও গাটা নরম। কিলটা নরম চর্বির থাকে এমন পড়ল যেন জলে কিল মারবার মতো হল।

মদন এমনিতে ঠান্ডা ছেলে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। আজও কাড়ল না। তাইতেই কানাইয়ের মাথাটা আরো বিগড়ে গেল। হারামজাদা, গিদ্ধড়, পাজি, বদমাশ, নরাধম ঠিক নামতার মতো মুখে বলে যাচ্ছে কানাই আর মারছে। সে কি মার! মারের চোটে একবার গিয়ে দেয়ালে পড়ল, একবার ব্ল্যাকবোর্ডে, ফার্স্ট বেঞ্চের ডেস্কের কোনায় লেগে কপালটা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সমস্ত ক্লাস পাথরের মতো নিশ্চল। শুধু সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেধড়ক ঠ্যাঙানি চলেছে তো চলেইছে। ডাস্টারটা দিয়েও কানাই মাস্টার মদনের চোয়াল, মাথা কান ফাটিয়ে দিয়েছিল আজ।

এরকম মার বড় একটা দেখা যায়নি স্মরণকালে। আর কানাই মাস্টার নিজের ছেলের অসুখ হওয়ার পর থেকেই মারধর করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের খ্যাপা মার দেখে আশপাশের ক্লাস ফেলে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে দরজার কাছে ভিড় করে ফেললেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে বা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হেডস্যার এসে মাঝখানে পড়ে সেই আসুরিক ব্যাপার থামালেন। মদন তখন রক্তমাখা মুখে, ফাটা ঠোঁটে, ফোলা গাল, ছেঁড়া চুল আর তোবড়ানো জামাকাপড়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে—স্যার আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! আমাকে মেরে ফেলুন স্যার! জুতো মারুন স্যার, আমি আজই সুইসাইড করব স্যার।

মদন এত কথা কখনো বলে না। মার খেয়ে আজ তার মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। মার খাবার পরও তার চেঁচানি আর থামে না। কেবল কাঁদে আর আরো মারতে বলে,

সুইসাইড করবে বলে চেঁচায়। নিজের ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে সে সারা ইস্কুলময় দৌড়োদৌড়ি করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কানাই মাস্টারের কুপিত বায়ু যখন ঠান্ডা হল তখন সে মদনের আচরণ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলেটার হল কী?

টিচার্স রুমে কানাই মাস্টারকে সবাই ধরে এনে পাখার তলায় বসিয়েছে। ইস্কুলের সামনে পাবলিকের ভিড় জমে গেছে। এই অবস্থায় মদন দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে মাস্টারমশাইদের পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে বলছে, লাথি মারুন স্যার, জুতো মারুন স্যার, আবার উঠে গিয়ে আর একজনের পায়ে পড়ে ওরকম বলে।

হেডমাস্টারমশাই এসে কানাই মাস্টারের কানে কানে বললেন—ছেলেটার ব্রেনটা বোধ হয় ড্যামেজ হয়েছে। আপনি আর স্পটে থাকবেন না, বাড়ি চলে যান।

শুনে কানাইয়ের শরীর হিম হয়ে গেল। আর বুকের কি ধড়ফড়ানি! শশী বেয়ারা রিকশা ডেকে দিল। কানাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই শয্যা নিয়ে রইল। সারাদিন ভাবছে—এ আমার আজ কী হয়েছিল? এ আমি করলাম কী?

বিকেলের দিকে একবার উঠে এসে নিজের ছেলের বিছানায় বসল কানাই। কৃশ করুণ মুখ তুলে ছেলেটা চাইল বাবার দিকে। একটু হাসল। সে হাসি কান্নার ওপরকার সরের মতো। বড় সহ্যশক্তি ছেলেটার। কত সহ্য করছে! কানাই ভাবে, ওর ব্যথাগুলো কেন আমার হয় না?

ভাবতে ভাবতে বিছের হুলের মতো মদনের কথা মনে পড়ে। বড় যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। এত পাপ কি ভগবান সইবেন। মদনের যদি ভালমন্দ কিছু হয় তো তার কর্মফল কানাইকেও অর্সাবে। যদি সে পাপ ছেলেটার ওপর এসে পড়ে।

বাইরে কে ডাকছে। কানাইয়ের বউ দিনরাত কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে আজকাল বড় রোগা হয়ে গেছে। চেনা যায় না! সে এসে বলল, ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে।

বুক কেঁপে গেল। তবু নিজেকে শক্ত উঠে এল কানাই।

বড় ক্লাসের কয়েকটা ছেলে গম্ভীরমুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন মাতব্বর গোছের ছেলে বলল—স্যার মদনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—হাসপাতাল! বলে কানাই হাঁ।

অন্য একটা ফচকে ছেলে বলল—আপনি ঘাবড়াবেন না স্যার। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে মাত্র। আর কিছু নয়।

ছেলেরা চলে গেলেও হতভম্ব ভাবটা যায়নি কানাই মাস্টারের। ঘর থেকে কয়েকদিন না বেরোনই ভাল। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই ক্ষেপে আছে। কে কোথা থেকে আধলা ছুড়বে হয়তো। নাহলে ধরে ঠ্যাঙালেই বা কী করার আছে! সবচেয়ে চিত্তির হয় যদি মদনের বাবা পুলিশের কাছে যায়। যায়নি কি আর! গেছে। পুলিশও বোধহয় এতক্ষণে রওনা হওয়ার জন্য কোমরের কষি বাঁধতে লেগেছে। রক্তপাতে ফৌজদারি হয় সবাই জানে।

ছেলের মা এসে বলল, বাজারে যাও। তেল-মশলা কিছু নেই।

শ্বাস ছেড়ে কানাই ওঠে। সন্ধের মুখে রামমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। সঙ্গে ঠনঠন কাঁসির আওয়াজ রোজ ভাল লাগে না। আজ লাগল। ঘণ্টা ডাকছে।

কানাই বেরিয়ে পড়ে। চোখে জল আসছে। বুকটা কেমন করে। কোনোকালে

মন্দিরে যায় না কানাই মাস্টার। আজ ভাবল একবার যাবে। বুড়ো চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। সবাই বলে লোকটা খুব বড় মানুষ। এককালে তাঁর ভয় হত। জিজ্ঞেস করবে—আমার পাপ কি ছেলেতে অর্সাবে ঠাকুর।

৩

রেবার গানের মাস্টারমশাই এসেছে। লোকটা ছোকরা, তার ওপর গান শেখায়। এসব লোক বড় বিপজ্জনক হয়।

তাই প্রথম প্রথম গানের মাস্টার এলেই হেম গিয়ে ঘরে মোড়া পেতে বসে সব লক্ষ করত। গানের আড়ালে আবডালে দুজনের কোনো হেলন দোলন নজরে পড়ে কিনা।

একদিন রেবা ধমক দিল মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর। বলল—সুরের কিছু বোঝো না, তবু সামনে গিয়ে অমন হাঁ করে বসে থাকো কেন বলো তো? তুমি সামনে থাকলে আমার গাইতে বড় লজ্জা করে। আর কখনো ওরকম করবে না বলে দিচ্ছি।

কপাল এমনই যে হেমের বউ রেবা বেশ সুন্দরীই। সাদাটে রং, লম্বাটে গড়ন, মুখখানা মন্দ নয়, তার ওপর চোখ দুখানা ভারি মিঠে। এমন করে তাকায় যেন সব সময় বড় অবাক হয়ে আছে। এই রকম বউ যার থাকে তার বড় জ্বালা।

হেমের আজকাল বার বার ডাইসে হাত পড়ে যায়। গরম লোহার ছেঁকাও বিয়ের পর থেকে বড্ড বেশি খাচ্ছে হেম। কারখানায় কাজের সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে আরো কত বিপদ হতে পারে। রেবার মতো সুন্দরী বউ জুটবে এমন ভরসা তার ছিল না কখনো, তবু কোন পুরুষ না বিয়ের আগে সুন্দরী বউয়ের কথা ভাবে। হেমও ভাবত। কিন্তু এ জ্বালা জানলে বিয়েতে বসবার আগে আর একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখত সে।

বিয়ের পর একদিন হাওড়ার খুরুট রোডের কাছে সিনেমা দেখতে গেছে। টিকিট কাটবার পর শো শুরু হতে দেরি আছে দেখে হেম রেবাকে নিয়ে লেমোনেড খেতে গেল। রেবা লেমোনেড দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি খেল। রেবার বড়ি খাওয়ার দৃশ্যটা হাঁ করে দেখছিল হেম। দেখতে গিয়ে এত মজে গিয়েছিল যে সে নিজেও রেবার মতো ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে বড়ি গেলার মতো ভাব করে ফেলেছিল নিজের অজান্তে। তারপর যখন রেবা লেমোনেডের ঝাঁঝে মুখচোখ কোঁচকালো তখন তাই দেখে হেমেরও কোঁচকালো। আর এইসব হওয়ার সময়ে দোকানের চওড়া আয়নায় হেম হঠাৎ দেখতে পায় তিন-চারটে বখা ছেলে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রেবার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি বলাবলি করছে।

ভ্রূ কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকে সে। মাথা বিগড়ে গেল। সে গুন্ডা নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হলে ভাল হত। তার বউয়ের দিকে নাহক লোকে তাকাবে— এ কেমন কথা?

হলে ঢুকবার পর গণ্ডগোলটা পাকাল। সেই তিনটে ছোঁড়া একেবারে পিছনের সিটে। হেম ছবি দেখবে কি, বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে। নিউজরিল শেষ হয়ে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলবার সময়ে দেখল এক ছোকরা রেবার সিটের পিছনে হাত রেখেছে। আর যাবে কোথায়!

—কীরকম ভদ্রলোক হে তুমি? ভদ্রমহিলার একেবারে ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছ? এই বলে খেঁকিয়ে উঠেছিল সে।

ছেলেগুলো আচমকা ধমক খেয়ে প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপরই তেড়ে ফুঁড়ে তারাও তড়পাতে থাকে—কে মেয়েছেলের ঘাড়ে হাত রেখেছে? আপনি তুমি-তুমি করে বলছেন কেন? অত ছুঁচিবাই থাকলে মেয়েছেলে সিন্দুকে ভরে রেখে আসবেন। লেডিজ সিটে গিয়ে বসবেন এবার থেকে।

হেম হাতফাত চালিয়ে দিত ঠিক। রেবাই তাকে সামলায়। পরে বাড়ি ফেরার সময় বলেছিল—ওরা কিছু তো করেনি, তুমি রেগে গেলে কেন?

রাগ যে কেন হয় হেমের, তা কারো বোঝার নয়। এই জীবনটা এই রকম জ্বলে পুড়ে যাবে।

ছোকরা গানের মাস্টার ঘরে সন্ধের আলো জ্বালবার মুখটাতেই এসে হাজির। রেবা প্রায় দুপুর-দুপুর বেলা থেকে খুব সেজে বসে আছে। কোলে খোলা গানের খাতা নিয়ে বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তখন থেকে 'কৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা সিরাজি মাগে' লাইনটায় সুর লাগাচ্ছে। হেমকে দেখেও দেখছে না।

হেম ঘোষের গলায় এক সময়ে সুর ছিল। না ঠিক গানের গলা নয়! তবে সিনেমা বা রেডিওর গান গুনগুন করতে প্রায় সুরটা এনে ফেলত।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না কি যে, হেম খুব গোপনে কোনো বড় ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখে খুব বড় গাইয়ে হয়ে গেল একদিন। রেবা টেরও পেল না এত কাণ্ড। তারপর কোনোদিন হয়তো রেবার মাস্টার গান শেখাতে এসে সুর তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, এমন সময়ে সাদামাটা চাবির কারিগর হেম ঘোষ হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত সুরে গানটা গেয়ে দিল! রেবা তখন যা অবাক হয়ে তাকাবে না। সেই দিনই মাস্টারকে অহঙ্কারের সঙ্গে বলে দেবে—আর আপনাকে দরকার হবে না প্রভাসদা। তারপর হেমের সঙ্গে যখন একা হবে রেবা তখন দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে হেমের কালো মোটা ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলবে— তোমার ভিতরে কত জাদু আছে বলো তো! তখন হেম খুব হাসবে। খুব হাসবে। একেবারে হেঃ হেঃ করে পেট ভরে হেসে নেবে একচোট।

দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এইসব ভাবল সে। ঘর থেকে গান আসছে, গোয়াল থেকে মশা। আর শুকনো গোবরের গন্ধ। কাঁকড়াবিছের চিন্তাটাও বড্ড পেয়ে বসেছে হেমকে। চক্কোত্তিমশাই অনেক ওষুধ জানেন। দিনেকালে কত শক্ত রোগ ভালো করেছেন বলে শোনা যায়। একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁকড়াবিছে কামড়ালে কী ওষুধ দিলে আরাম হয় তা ফাঁকমতো জেনে আসবে হেম। রেবার যা সুখের শরীর, একবার বিষবিচ্ছুর কামড় খেলে ফুলের মতো শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে না? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

...'কেউ বা সিরাজি মাগে—এ-এ' গানের মাস্টারের ভরাট গলার সঙ্গে ডুয়েটে রেবার কোকিলস্বর জড়ামড়ি করছে। সইতে পারে না হেম ঘোষ। বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, আর ধরাতে ইচ্ছে হল না। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরোবে।

হেমের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর জামাটা চড়িয়ে নিলে হত। কিন্তু এ সময়টায় ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না। রেবা রেগে যাবে ঘরে ঢুকলে।

উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে বেরোনোর দরজা। ঠিক দরজার চৌকাঠে মুখোমুখি কালিদাসীর ছেলে অভয়পদর সঙ্গে দেখা। অভয়পদর হাতে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি। ঝালের চোটে শিস টানছিল। হেম ঘোষকে দেখে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল। হেম হাত পাতলে ঠোঙা উপুড় করে দেয় অভয়। তলানি মুড়িতে যত কুঁড়ো মিশে আছে। তাই মুখে ফেলে হেম ঘোষ বলে—খবর কী?

—আর খবর! অভয়পদ বলে—আজও মোহনবাগানের একটা পয়েন্ট গেল।

হেম ঘোষ খেলার মাঠের খবর রাখে না। তবু অভয়পদকে তোয়াজ করবার জন্য বলল—এঃ হেঃ! একটা পয়েন্ট চলে গেল?

অভয়পদর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাওড়ার বিখ্যাত মাতব্বর জ্ঞান সরকারের শাগরেদ। জ্ঞানদা ওর মাথাটা খেয়ে রেখেছে। ঘুমে জাগরণে সবসময়ে ওর মুখে জ্ঞানদা আর মোহনবাগানের কথা। কবে জ্ঞানদা ডেকে অভয়পদর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেছে, কবে যেন বলেছে—অভয়, আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা চাকর ঠিক করে দিস তো, কবে হয়তো জ্ঞানদার গাড়িতে উঠে বড়বাজারের লোহাপট্টিতে গেছে এ সবই অভয়পদর বলবার মতো কথা। আজকাল অভয়পদকে দেখলেই লোকে সটকাবার তাল করে। কাঁহাতক জ্ঞানদার বৃত্তান্ত শোনা যায়!

হেম ঘোষের সেই ভয়। তবে কিনা অভয়পদর আর কোনো দোষ নেই। বরং জ্ঞানদার শাকরেদি করে সে চিরকুমার রয়ে গেছে, মেয়েমানুষকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, লোকের বেবিফুড জোগাড় করে দেয়, ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসে পাঁচজনের। মড়া পোড়াতে যায়। বাড়ি ভাড়ার টাকা তুলে, দুধ আর ঘুঁটে বেচে মা কালিদাসী সংসারটাকে কষ্টেসৃষ্টে টেনে নেয়। নিষ্কর্মা অভয়পদ তাই বড় সুখে আছে।

অভয়পদ বলল—আজ একটা মিটিং আছে জ্ঞানদার বাড়িতে, বুঝলে? চা-টা খেয়েই বেরোব।

—খুব ভাল। বলে হেম বেরিয়ে আসছিল।

মানুষ যে কেন খামোকা মিটিং করে মরে আজও হেম বোঝে না। যত সব ফালতু কারবার। দশটা মাথা এক হয়ে যত সব গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর।

সিঁড়ির মুখ থেকে অভয়পদ ফিরে এসে বলল—ও হেম, শোনো।

হেম ভয়ে সিটিয়ে যায়। মিটিং-এর কথা না ফেঁদে বসে। ওসব কথায় বড্ড মাথা বিগড়ে যায় তার।

অভয়পদ গলার স্বর নামিয়ে বলে—তোমার বউ কি সিগারেট-টিগারেট টানে নাকি! রাতে ওপরের বারান্দা থেকে যেন দেখলুম উঠোনে রেবা সিগারেটে টান মারতে মারতে পায়চারি করছে।

কী কেলেঙ্কারি! হেমের ভিতরটা যেন লজ্জায় গর্তের মতো হয়ে যায়। কাল তখন অনেক রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী জ্যোছনা দেখতে উঠোনের দিকে দাওয়ায় এসে বসেছিল একটু। এমনিতে হেম ঘোষ সিগারেট খায় না, রেবার চাপাচাপিতে ইদানীং খেতে হচ্ছে।

কাল রাতেও খাচ্ছিল। সদ্য ধরানো সিগারেটটায় দু টান দিতে না দিতেই রেবা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল—আমি খাব।

হেম অবাক। দেখে, রেবা দিব্যি ফসফস টান মারছে। কাশিটাশি নেই, চোখে জলও এল না ধোঁয়ায়। বলল—আগে খেতেটেতে নাকি?

—কত! বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে অনেক খেয়েছি। বেশ লাগে।

বলে রেবা সিগারেট টানতে টানতে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে সময়ে বাড়ির কারো জেগে থাকবার কথা নয়। তারাও কিছু টের পায়নি। রামচন্দ্র হে! অভয়পদ দেখে ফেলেছে তবে!

হেম ঘোষ হেসে আমতা আমতা করে বলে—ঐ শখ করে দুটো টান দিয়েছিল আর কি! তারপর কেশে-টেশে ফেলে দেয়।

অভয়পদ আদর্শবাদী লোক। মুখটা কেমনধারা করে বলল—দেশটা যে একেবারে সাহেব হয়ে গেল হেম! ভারতবর্ষের কত সম্পদ ছিল!

কথাটা ভাল বুঝল না হেম। অভয়পদও বুঝিয়ে বলল না। চলে গেল।

রেবাকে সিগারেট খেতে অভয় দেখেছে, লজ্জা শুধু সেজন্যই নয়। হেম ঘোষ আর একটা কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে জিভ কাটল। কী কেলেঙ্কারি। কাল জ্যোছনায় তাদের দুজনেরই বড় রস উস্কেছিল। নিরিবিলি, নিশুতি জ্যোছনায় পরীর মতো বউটাকে দেখে খুব দু-চারটে দেহতত্ত্বের কথা হেসে হেসে বলে ফেলেছিল হেম। রেবাও দু-চারটে ভাল টিপ্পনী ঝেড়েছিল। দোষের কথা নয়। স্বামী-স্ত্রী একা হলে এরকম কত কথা হয়! কিন্তু সেসবই যে শুনে ফেলেছে অভয়পদ! কী লজ্জা। কী লজ্জা!

এই জিভ কাটা অবস্থায় হেম ঘোষ যখন দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই একজোড়া মাঝ-বয়সী স্বামী-স্ত্রী ভুঁইফোঁড়ের মতো তার সামনে কোত্থেকে হাজির হয়ে আচমকা বলল—আচ্ছা মশাই, গুন্টু কি বাড়িতে আছে?

আর এক দফা লজ্জা পেয়ে হেম বলে—না, সে মন্দিরে কাঁসি বাজাতে গেছে।

৪

গুন্টু যখন কাঁসি বাজায় তখন সে নিজেই শব্দ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী রকম হয়, কাঁসি বাজাতে বাজাতে শব্দটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। কাঁইনানা কাঁইনানা হয়ে বাজতে বাজতে কানে তালা ধরে আসে, শরীর ঝিমঝিম করে। তারপর শব্দটা যেন তার চারধারে লাফাতে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বহুদূর চলে যায়। আবার ফিরে আসে। তারপরই সে পরিষ্কার টের পায় শব্দটা আকাশ বাতাস সব হাঁ করে গিলে ফেলল। প্রকাণ্ড হয়ে গেল। দুনিয়াভর হয়ে গেল। আকাশভর হয়ে গেল। তারপর আর গুন্টু নিজেকে টের পায় না। বড় মজা হয় তখন। গুন্টু শব্দ হয়ে যায়।

মাস দুই আগে গুন্টু চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাগানে পেয়ারা চুরি করতে ঢুকেছিল। দুপুরবেলা। কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা শিরীষগাছে এক হনুমানকে দেখতে পেল সে, বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে।

যে কোনো কিছুকে লক্ষ করে ঢিল ছোড়া গুন্টুর স্বভাব। বে-খেয়ালে কত সময় কত মারাত্মক জায়গায় ঢিল ছুড়েছে সে। চলন্ত গাড়ির হেডলাইট ফাটিয়েছে একবার, রাস্তায়

আলো ভেঙেছে কতবার, জ্ঞান সরকারের বাইরের ঘরের দেওয়ালঘড়িটা রাস্তা থেকে ঢিল ছুড়ে ভেঙেছিল।

সেই স্বভাববশে হনুমানটার দিকেও খামোকা একটা মুঠোভর ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ে মেরেছিল। হনুমানটার তেমন লাগেনি তাতে। কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেটা হড়হড় করে গাছ থেকে নেমে এসে তাড়া করল গুন্টুকে। গুন্টু দৌড় দৌড়। জংলা বাগানটার মাঝবরাবর পুরোনো পুকুর, তাতে সবুজ শ্যাওলা থিকথিক করছে, বড় বড় মাছ। অন্যদিকে পথ না পেয়ে গুন্টু সেই পুকুরে ঝাঁপ খায়।

গুন্টু সাঁতরায় ভালই। কিন্তু ত্যাঁদড় হনুমানটার জ্বালায় কিছুতেই আর জল ছেড়ে উঠতে পারে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিকেই সেটা গিয়ে হুপ হুপ করে হাঁক ছাড়ে। সেই হাঁক-ডাকে আরো কয়েকটা হনুমান কোত্থেকে এসে জুটল। অথৈ জলের মধ্যে গুন্টুকে সারাক্ষণ হাত পা নেড়ে ভেসে থাকতে হয়েছিল। ফলে পচা আঁষটে গন্ধ, শ্যাওলার লতা বারবার পায়ে হাতে জড়াচ্ছে, বড় বড় জাহাজের মতো মাছ মাঝে মাঝে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘষটে যাচ্ছে। কয়েকবার লেজের ঝাপটা খেল। এক হাত তফাত দিয়ে সাঁতরে চলে গেল একটা জলঢোঁড়া। পায়ের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ডুব দিয়ে বহুবার থৈ খুঁজে পেল না গুন্টু। তার কচি বুকে দম বেশি ছিল না তো। তাই এক সময়ে হঠাৎ চোখের সামনে সূর্য নিবু নিবু হয়ে গেল, বুকে বাতাসের টান, হাতে পায়ে খিল। সে তখন বিড় বিড় করে বলেছিল—আমি যে রোজ সন্ধেয় তোমার মন্দিরে আরতির সময়ে কাঁসি বাজাই!

তারপরই হঠাৎ যেন এক পাতালপুরীর হাত এসে গুন্টুকে টেনে নিল জলের তলায়।

সেইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। মরলে তো সবাই তাঁর দেখা পায়। গুন্টু গিয়ে দেখে আরেব্বাস। সেখানে পেল্লার চৌকি পেতে বুড়ো চক্কোত্তিমশাই বসে তামাক খাচ্ছেন। তাকে দেখে বলে উঠলেন—গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত! গুন্টু রাজার গালে হাত!

তা গালে হাত দেওয়ারই দাখিল। যা অবাক হয়েছিল। তবু গুন্টু চক্কোত্তিমশাইকে অচিন জায়গায় পেয়ে ভারি খুশি। প্রণাম করে ফের ভাল করে তামাক সেজে দিল। চক্কোত্তিমশাই বললেন—তা শব্দ হওয়া ভাল। দুনিয়াটা হলই তো শব্দ থেকে। যেখানে সেখানে ভাল করে যদি শুনিস তো দেখবি, দুনিয়ায় সব শব্দ। তুইও শব্দ, আমিও শব্দ। মনে করিয়ে দিস, তোকে ভাল দিন দেখে একটা শব্দ দেবো'খন। সে এমন শব্দ যে কাঁসির শব্দ তার কাছে কোথায় লাগে। এখন যা।

ডোবার আঘঘণ্টা পর গুন্টু ফের ভেসে উঠেছিল। পেটে জল, মুখে গাঁজলা, চোখের মণি ওলটানো, জ্ঞান নেই, মৃত্যুক্ষীণ নাড়ী চলছে না। তাই দেখে হনুমানগুলো এমন হাল্লাচিল্লা ফেলে দিয়েছিল যে চৌধুরী বাগানের বুড়ো মালী এসে পড়েছিল দুপুরের ঘুম ভেঙে। সেই তোলে গুন্টুকে। পেটের জল বার করে সেঁক তাপ দেয়। ডাক্তার বদ্যি করতে হয়নি, হাসপাতালেও যেতে হয়নি। কেউ তেমন টেরও পায়নি ঘটনা।

বেঁচে গিয়ে তেমন অবাক হয়নি গুন্টু। কেমন করে যেন মনে হয়—মরলেই হল

আর কি! চক্কোত্তিমশাই সব জায়গায় পাহারা দিচ্ছে না! যেখানেই যায় গিয়ে দেখবে ঠিক বুড়ো মানুষ আপদবিপদের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে তামাক খাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

রামমন্দিরে আরতির সময় এখনো বেজায় ভিড় হয়। নতুন ঠাকুরমশাই আরতিও করেন ভাল, তবে কিনা চক্কোত্তিমশাইয়ের আরতি যারা দেখেছে তাদের চোখে অন্য কিছু আর লাগে না। তবু অভ্যাসবশে মানুষ এসে দাঁড়ায় খানিক।

এখান থেকে চালচালাটা বেশি দূর নয়। নাটমন্দিরের পর একটা মাঠ তারপর একটা কাঁচা রাস্তা, সেটা পেরিয়েই বাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে কাঠের ফটক। কয়েকটা ফুল গাছের ঝোপ, জোনাকি পোকার আলো, একটু অন্ধকার। খোলা দাওয়ায় একটা চৌকি পাতা, সাদা বিছানা, মেঝেয় চটি জোড়া নিখুঁতভাবে রাখা, একপাশে গড়গড়া। বিছানায় চক্কোত্তিমশাই দুটো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে থাকেন। গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হয়।

আউন্তি যাউন্তি মানুষজন দুদণ্ড দাঁড়ায় এসে সামনে। বলে—চক্কোত্তিমশাই, মন্দিরের পুজোয় আর যে যান না।

বুড়ো মানুষটি একগাল হেসে বলেন—রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন বে না হয়। বিয়ে করে আসল ঘরসংসার পেলে আর পুতুল খেলে কে রে?

লোকে একটু-আধটু বোঝে না যে তা নয়।

গুন্টু বোঝে। আরতির পর গুন্টুর অনেকক্ষণ সাড় থাকে না। মগজে তখন কেবল ঘণ্টার শব্দ, কেবল কাঁসির আওয়াজ।

একদিন বলে ফেলেছিল গুন্টু—আরতির পর আমি এক অন্যরকম ঘণ্টার শব্দ শুনি। সে আওয়াজ মন্দিরের নয়, অন্য জায়গা থেকে আসে।

চক্কোত্তিমশাই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—খুব মনপ্রাণ দিয়ে শুনবি। কাউকে বলিস না।

গুন্টুর মায়ের কথা মনে নেই। সে মায়ের পেট থেকে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা যায়। সেই থেকে সে দিদিমার কাছে। তার বাবা আবার বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রাম থেকে বাবা তাকে দেখতে আসে। ভারি নিরীহ, ভীতু মানুষ, দ্বিতীয় পক্ষের দাপটে অস্থির। দ্বিতীয় পক্ষ আসতেও দেয় না বড় একটা। কিন্তু বাবা এলে গুন্টুকে দেখে ভারি খুশি হয়। এক গাল হাসে, বড় চোখে হাঁ করে এমনভাবে দেখে যেমন লোভী লোক খাবারের দোকানের দিকে চায়।

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—বলো তো বাবা, তোমার কে কে আছে?

গুন্টু ভেবেছিস্তে বলেছিল—দিদিমা, মামা আর চক্কোত্তিমশাই।

বাবা অবাক হয়ে বলে—চক্কোত্তি আবার কে?

—সে আছে।

বাবা শ্বাস ফেলে বলল—আর আমি?

গুন্টু তখন লজ্জা পেয়ে বলে—হাঁ বাবা, তুমিও। আর সৎমা।

—ছিঃ বাবা, সৎমা বলতে নেই। লোকে খারাপ ভাববে। শুধু মা। আরো বলি

বাবা, তোমার কিন্তু আর দুটি বোন আছে। তারা তোমাকে ভারি দেখতে চায়। তোমার মাও বলে, এবার গুন্টুকে নিয়ে এসো।

গুন্টুর যেতে অনিচ্ছে তা নয়, কিন্তু দিদিমা ছাড়তে চায় না। কথা উঠলে বলে, আঁতুড় থেকে মানুষ করছি, ওর নাড়ী আমি ছাড়া আর তো কেউ চিনবে না। অন্যের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল, গুন্টু শুনেছে, তার সৎমায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, আর নাকি ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু সৎমায়ের খুব ছেলের শখ। তাই এখন প্রায়ই গুন্টুর বাবাকে বলে, সতীনপোকে নিয়ে এসো, তাকে নিজের ছেলে করে নেবো।

তাই বাবা আজকাল খুব ঘন ঘন আসে। গুন্টুও জানে, একদিন তাকে হয়তো ঝাড়গ্রামে চলে যেতে হবে, সৎমাকে সে দেখেনি। তবে 'মা' বলে কাউকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করে তার। আবার এ জায়গা ছেড়ে, দিদিমা মামা আর চক্কোত্তিমশাইকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছেও করে না। গুন্টুর আজকাল তাই মনটা দুভাগ হয়ে গেছে।

মামা প্রায়ই গুন্টুকে বলে—তোকে যা একটা লিডার তৈরি করব না গুন্টু, দেখে নিস। একটু বড় হ, তখন জ্ঞানদার কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ট্রেনিং দেওয়াবো। জ্ঞানদার হাতে কত লিডার তৈরি হয়েছে।

গুন্টুর লিডার হতে খুব ইচ্ছে।

আরতির শেষে আজ বড় একা একা লাগছিল গুন্টুর। কাঁসি বাজানোর সময় আজ তিনধা নাচন নেচেছে। এখন তাম্রপাত্র নিয়ে নাটমণ্ডপের ধারে বসে হাজারটা হাতের পাতায় তামার কুশি দিয়ে চরণামৃত দিচ্ছে। কত হাত! হাতগুলাতে ভয় লোভ হিংসে মাখানো। এক-আধটা হাত ভারি ঠান্ডা। দেখে দেখে আজকাল বুঝতে পারে সে।

একটা সাদা কাঁপা-কাঁপা হাত থেকে খানিক চরণামৃত চলকে পড়ে গেল। মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই গুন্টুর। কিন্তু সে ঠিক টের পায় এ হাতটা হল কানাই মাস্টারের। কানাই স্যারের প্রাণে আজ বড় কষ্ট।

একটা ছ্যাঁকা খাওয়া, কড়া পড়া বিদ্‌ঘুটে হাতে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল গুন্টু, এ হল হেম ঘোষ। হেম ঘোষের হাতটা কাকে যেন খুন করতে চায়।

একবার চক্কোত্তিমশাই একটা কচি বেলগাছ দেখিয়ে গুন্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বল তো কত পাতা আছে গাছটার।

ভেবেচিন্তে গুন্টু বলে—হাজার দুই হবে।

—দেখ তো গুনে।

সে বড় কষ্ট গেছে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছটার নিচে টুল পেতে তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাতা গুনতে হল। দাঁড়াল চার হাজারের ওপর। তবু একটা আন্দাজ হল।

সেই থেকে চক্কোত্তিমশাই এরকম হরেক জিনিস আন্দাজ করে শেখান গুন্টুকে। করতে করতে গুন্টুর আন্দাজ ভারি চমৎকার হয়েছে। খুব ঝুপসি গাছ হলেও তা দেখে টকাস করে বলে দিতে পারে তাতে পাতা কত। জানে, গুনে দেখলে ঠিক মিলে যাবে।

চক্কোত্তিমশাই শিখিয়েছেন, রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে সারা দিনের

কথা ভাববি। সকাল থেকে কী করলি, কী খেলি, সব হুবহু মনে করা চাই। এ না করে ঘুমোবি না।

তাই করত রোজ গুন্টু। ছমাস পর তার বেশ তড়তড়ে মনে হল। টক করে সব মনে পড়ে যেতে থাকে। তখন চক্কোত্তিমশাই শেখালেন, এবার রোজকার কথা, আর তার সঙ্গে আগের দিন, আগের আগের দিন এইভাবে মনে করবি। করতে করতে দেখবি একদিন তোর আর জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে।

—তাতে কী হয় চক্কোত্তিমশাই?

—তাহলে আর মানুষ মরে না। দেহ ছাড়ে, কিন্তু মরে না।

গুন্টুর দিকে আর একটা হাত এগিয়ে আসে। হাতে শাঁখা, তাতে সিঁদুরের দাগ। গুন্টু যেন এ হাত চেনে। কুশি তুলেও গুন্টু থেমে থাকে। এ হাত কি চরণামৃত চায়? এ হাত একটা ছেলে চায়। এ হাতের বড় আকুলি বিকুলি।

হাতটা ঐ অত হাতের ভিড়ের ভিতর থেকে একটু ওপরে উঠে এসে গুন্টুর থুতনি ধরে মুখখানা ওপরে তুলল। আর তখন নাটমন্দিরের জোর আলোয় একজোড়া জল টলটলে চোখ দেখতে পায় গুন্টু। ঘোমটার নিচে ফর্সা মুখ। ঠোঁটে একটা কান্নায় ভেজা হাসি। পিছনেই বাবা দাঁড়িয়ে। ভারি তটস্থভাবে বাবা মহিলাটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল—এখন না। ও এখন ব্যস্ত। বাড়িতে যাক, ভাল করে দেখো।

চোখ বুজে মহিলাটি বলে—এ যে দেবতার মতো ছেলে। আমার সতীন বড় ভাগ্যবতী ছিল।

গুন্টু ভারি লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাতে হাতে চরণামৃত ঢেলে দিতে থাকে সে। মাথা নিচু। কারো মুখের দিকে তাকানোর সময় নেই।

৫

রেবা ঝুঁকে গানের খাতা দেখছিল। গানের মাস্টার প্রভাস খানিকক্ষণ তবলায় আড়া চৌতাল তুলবার চেষ্টা করে এইমাত্র একটা সিগারেট ধরাল। নতমুখী রেবার দিকে চেয়ে রইল খানিক। বেশ দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে এমন করে তাকায় যে ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

প্রভাস অনেকদিন ধরেই বুঝবার চেষ্টা করছে, রেবার হাবভাবে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা। মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আছে। আবার কখনো মনে হয় না, নেই।

আছে কি নেই সেটা বুঝবার জন্যও একটা কিছু করা দরকার। ধসা কানা হয়ে বসে থেকে কোনোদিনই তা বোঝা যাবে না।

ভাবতে ভাবতে প্রভাস একবার বাঁয়ায় একটা টুম করে শব্দ তুলল। রেবা তাকাল না। বাঁ হাতখানা হারমোনিয়ামের ওপর দিয়ে এসে ঝুলছে। কী চমৎকার আঙুল! এই মেয়ের বর কিনা হেম ঘোষ! কাকের মুখে কমলালেবু।

প্রভাস আন্দাজ করে, হেম ঘোষের বউ হয়ে রেবা নিশ্চয়ই খুব সুখী নয়। তাহলে রেবা প্রভাসকে একেবারে হ্যাটা করবে না।

ভেবেচিন্তে প্রভাস আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একটা কিছু হোক। হয়ে যাক।

গানের সময়ে আজকাল ঘরের লোকজন তাড়িয়ে দরজা দিয়ে জানালার পর্দা

টেনে-টুনে দিয়ে বসে রেবা। সেটাও কি একটা ইঙ্গিত নয়? কোন বোকা এসব ইঙ্গিত ধরতে না পারে?

খুব সাহস হল প্রভাসের। আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

একটু ঝুঁকে প্রভাস হঠাৎ রেবার ঝুলন্ত হাতখানা খপাৎ করে চেপে ধরে ডেকে উঠলো—রেবা!

জানলার পর্দার ওপাশে অভয়পদ একটা অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে বেশ জোরে বলে উঠল—আগেই বলেছি কিনা মা, যে মেয়ে সিগারেট খায়, তার চরিত্র ভাল হতে পারে না। এসে দেখে যাও এখন স্বচক্ষে।

ঘরের ভিতরে প্রভাস তখন ছিটকে নেমে পড়েছে চৌকি থেকে। টর্চ জ্বেলে তাড়াহুড়ো করে চটি খুঁজছে। মনের ভুল। ঘাবড়ে গিয়ে ভুলে গেছে যে, চটি দরজার বাইরে ছেড়ে আসে রোজ।

রেবা সাদা মুখে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল—কী করলেন বলুন তো প্রভাসদা! এখন এ বাড়িতে কি আর থাকা যাবে! কত কষ্টে বাপের বাড়ির কাছে এই বাসা খুঁজে বের করেছি। এখন যদি ছাড়তে হয় তবে ও ঠিক আবার ওদের সংসারে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

প্রভাস দরজার কপাট হাতড়ে ছিটকিনি খুঁজছে তাড়াতাড়ি।

রেবা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এ বাসায় কত সস্তায় ছিলাম জানেন! এ অঞ্চলে পঁচিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে? বাড়িউলি মনুষটা কত ভাল ছিল। ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী করলেন বলুন তো!

প্রভাস ছিটকিনি খুলে চটি খোঁজার জন্য আর ঝামেলা করল না। দুই লাফে উঠোন পেরিয়ে খালি পায়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল—জোরে চালাও ভাই।

রেবা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর কেঁদে ফেলল। ইস, অভয়দা দেখে ফেলেছে। এখন ঠিক বাড়ি-ছাড়া করবে তাদের।

উঠোনের ওপাশের অন্ধকার থেকে কালিদাসীর গলা আসছিল—তোরই বা উঁকি মারতে যাওয়ার কী দরকার। ওসব লোক ওরকমই হয় বাবু। তুই নিজের কাজে যা।

—যাচ্ছি।

—গুন্টুটাকে ডেকে দিস তো। দুপুর থেকে ছেলের টিকি নেই।

রেবার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল—মাসিমা, আমাদের বাসা ছাড়তে বলবেন না। আমি গানের মাস্টারকে ছাড়িয়ে দেবো।

কিন্তু তা আর বলা হল না। সিঁড়িতে শব্দ করে কালিদাসী উঠে গেল।

গুম হয়ে বসে রইল রেবা। এ বাড়িতে যে কত সুবিধে! খুব সস্তায় কালিদাসীর কাছ থেকে ঘুঁটে কেনে রেবা। আড়াই টাকা সের দরে খাঁটি গরুর দুধ কেনে।

প্রভাসের জন্য সব গেল।

৬

নাটমন্দিরের নিচে নেমে এসে কানাই মাস্টার হাজার জোড়া জুতোর মধ্যে নিজের জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতোও বটে।

হেম ঘোষ নেমে এসে বলল—কী খুঁজছেন মাস্টারমশাই, জুতো? বলে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরল।

কানাই জুতো খুঁজে পেয়ে হেম ঘোষকে বলল—যাবেন নাকি বাজারের দিকে?

একা চলাফেরা করতে আজ কানাইয়ের ঠিক সাহস হচ্ছে না। মারাটা বড় খারাপ হয়েছে মদনকে। একবার যাবে চক্কোত্তিমশাইয়ে কাছে, ফাঁকমতো।

হেম ঘোষ উদাস গলায় বলে—সকালেই বাজার করেছি। তা আমার আর কাজ কী, চলুন বরং বাজার থেকে ঘুরেই আসি একটু। বাজার জায়গাটা ভাল।

হেমের মনে একটা পোকা কামড়াচ্ছে তখন থেকে। একা ঘরে রেবা আর গানের মাস্টার। চোখে চোখে কথা হচ্ছে না তো। কিংবা হারমোনিয়ামের রীডে একজনের আঙুলে অন্যজনের আঙুলে ছোঁয়া লাগে যদি! এর চেয়ে নিজেদের সংসারে বেশ ছিল। দশ জোড়া পাহারা দেওয়ার চোখ ছিল সেখানে। কাঁকড়াবিছের কথাও ভাবে হেম ঘোষ। ওষুধটা চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

মনের কথা মনে রেখে দুজনে অন্য সব কথা বলতে বলতে বাজারপানে যেতে থাকে।

৭

কালিদাসী ডাক শুনে বারান্দায় এসে দেখে উঠোনে জামাই দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বউ আর দুটো মেয়ে।

কালিদাসী শ্বাস ছাড়ে। জামাই আসবে জানাই ছিল। গুন্টুকে বুঝি এবার নিয়ে যায়।

—এসো। বলে নীরস গলায় ডাকে কালিদাসী।

ওরা উঠে আসে।

জামাই প্রণাম করতে করতেই বলে—গুন্টুকে নিয়ে যেতে এলাম মা, অনেকদিন হয়ে গেল। আপনারও কষ্ট বুড়োবয়সে।

কালিদাসী মন্দার মাকে মিষ্টি আনতে পাঠায়। তারপর গম্ভীরমুখে এসে সামনে বসে। বলে—যার ধন সে তো নেবেই। ঠেকাবো কোন আইনে। এই বুঝি মেয়ে দুটি? বেশ মিষ্টি দেখতে হয়েছে। আর এ আমার নতুন মেয়েটিও বেশ।

এসবই মুখের ভদ্রতা। বুকের ভিতরে ভিতরে জ্বলে যায়। কাঁকড়াবিছে কোন ফাঁকে পাঁজর কেটে বুকের ভিতর সেঁধিয়েছে। এ হুলের বড় জ্বালা।

খানিকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে ওরা চলে গেল। কাল সকালে গুন্টুকে ওরা নিতে আসবে।

কালিদাসী একটা চাদর গায়ে নিচে নেমে এসে ডাকল— রেবা। ও রেবা!

রেবা শুয়ে ছিল বিছানায়। ডাক শুনে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এই বুঝি বাড়ি ছাড়বার কথা বলছে এসেছে!

কিন্তু না। কালিদাসী বলল—আমাকে একবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে যেতে হবে। মন্দার মা বাড়ি গেল, তা তুমি যদি একটু সঙ্গে চলো মা। আমার তো চোখে ভাল ঠাহর হয় না রাতবিরেতে।

—যাচ্ছি মাসিমা। বলে রেবা তক্ষুনি চটি পায়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে অবশ্য জিভ কাটল রেবা। চটি জোড়া তার নয়, প্রভাসের। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুঝতে পারেনি। এখন আর কিছু করার নেই।

রেবা বলল—মাসিমা, আমার কী দোষ বলুন। লোকটা যে ও রকম তা কি জানতাম!

কালিদাসীর বুকভরা তখন গুন্টুর চিন্তা। বলল— সে জানি বাছা। আজকালকার লোক বড় ভাল নয়। সাবধানে থাকবে।

রেবা কালিদাসীকে ধরে খুব যত্নে কাঁচা ড্রেনটা পার করাল। মনে মনে বলল—চক্কোত্তিমশাই, দেখো বুড়ি যেন আমাদের না তাড়ায়।

৮

গুন্টুকে নিয়ে রেলগাড়ি হাওড়া ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানালার ধারে বসে সে এখন বাইরে গ্রাম আর ক্ষেত দেখছে। গা ঘেঁষে ছোটো বোন দুটি বসে। মা একটু তফাত থেকে মাঝে মাঝে মুগ্ধচোখে তার মুখের দিকে চাইছে। আর বার বার জিজ্ঞেস করছে, খিদে পেয়েছে বাবা তোমার? কিছু দিই? সন্দেশ আছে, রসগোল্লা, লুচি। কত এনেছি দ্যাখো। বাবা একবার কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল—মাকে তোর পছন্দ হয়েছে তো গুন্টু?

গুন্টু ঘাড় নাড়ল। বেশ মা। বোন দুটিও বড় ভাল। এ রকম মা বোন তার ছিল না তো এতদিন! দিদিমা বড় কেঁদেছে ভুঁয়ে পড়ে। মামা স্টেশন পর্যন্ত শুকনো মুখে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেছে। চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসেনি । মনটা বড় খারাপ লাগে। আবার ভাবে, নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে না জানি কত ফুর্তি হবে। কত খেলা!

৯

দিন ফুরোয়। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে। কানাই মাস্টার টিউশনিতে বেরোলো। হেম আজ গেল রেবাকে নিয়ে সিনেমায়। অভয়পদ পরোটা খেয়ে পুজো কমিটির মিটিং-এ যাওয়ার সময় বলে গেল—মা, যাই। কালিদাসী শুনতে পেল না, সে তখন গোয়ালঘরে গরু দুটোর সঙ্গে রাজ্যের কথা ফেঁদে বসেছে।

দিনটা গেল, যেমন যায়।

ইচ্ছে

দেশলাইয়ের কাঠির অর্ধেক ভেঙে দাঁত খুঁচিয়েছিল কখন। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাঁটুলাল দেখে খোলের মধ্যে সেই শিবরাত্রির সলতে আধখানা বারুদমুখো কাঠি দেমাক দেখিয়ে পড়ে আছে।

আজ চৈত্রের হাওয়া ছেড়েছে খুব। কাল বৃষ্টি গেছে ক'ফোঁটা, কিন্তু আজই তেজালো রোদ আর খড়নাড়ার মতো শুকনো হাওয়া দিচ্ছে দেখ। হাওয়ার থাবায় এক ঝটকায় কাঠির মিনমিনে আগুন নিবে যাবে। যদি তাই যায় তো আরো চার পো পথ বিন-বিড়িতে হাঁটো। তারপর হাজারির দোকানের আগুন-দড়িতে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অতক্ষণ বিড়ি ছাড়া হাঁটা যায়! মুখে থুথু আসবে, বুক আঁকুপাঁকু করবে, কী নেই-কী নেই মনে হবে।

সাঁটুলাল দেশলাইয়ের বাক্সটা নাড়ে। ভিতরে টুকাটুক শব্দ করে আধখানা কাঠি দেমাকভরে নড়ে চড়ে। কাঠিটার মতলব বুঝতে পারে না সাঁটু। শালা কি বিড়ি ধরানোর ঠিক মুখে নিবে গিয়ে তাকে জব্দ করবে?

তার জীবনে পাপের অভাব নেই। ফর্দ করতে গেলে শেষ হওয়ার নয়। বেশি কথা কি, এই দেশলাইটা তো গত পরশু বাবুদের উঠোন পড়ে থাকতে দেখে হাতিয়ে নেয়। ঝি উনুন ধরাতে এসে ফেলে গিয়েছিল ভুলে। পরে এসে দেশলাই খুঁজে না পেয়ে বাপান্ত করেছিল। তা সে সাঁটুর উদ্দেশেই বলা, নাম ধরে না বললেও, শুনে সাঁটু ভেবেছিল—নাঃ, কাল থেকে ভাল হয়ে যাব।

সাঁটু দেশলাইটা হাতে নিঠে মাঠের মধ্যিখানে ঢিবিটার ওপর বসে থাকে। দাঁতে আটকানো বিড়ি। ধরায়নি। সাঁটু ভাবে, বাবুদের বাড়ির ঝি সরস্বতীর কি উচিত হয়েছে সাঁটুকে অমন বাপ-মা তুলে গাল দেওয়াটা? ছেলের মাথা খেতেও বলেছে। যত যাই হোক সরস্বতী তো সাঁটুরই বউ! আজ না হয় সে পয়সাওলা লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। তা সুখচন্দ্রের পয়সাই বা এমনকী। আটাকল খুলে ধরাকে সরা দেখছে। তারও আগের পক্ষের বউয়ের হ্যাপা সামলাতে হয়। সরস্বতী ভাবে সুখচন্দ্র তাকে চিরকাল মাথায় নিয়ে নাচবে। ফুঃ! লাথি দিল বলে। বেশি দিন নয়।

ছেলের মাথা খেতে বলা সরস্বতীর ঠিক হয়নি। ছেলে তো সাঁটুর একার নয়, তারও। কিন্তু রেগে গেলে সরস্বতীর আর সেসব খেয়াল থাকে না। রেগে গেলে সরস্বতী একেবারে দিগবসনা।

ঢিবির ওপর কয়েক জায়গায় ঘাস পুড়ে ডাক পড়েছে। এখানে সেখানে আংরা পড়ে আছে, ছাই উড়ছে অল্পস্বল্প। ডাকাতে সাধুটা কদিন আগেও এখানে থানা গেড়ে ছিল।

আজকাল সাঁটুলালের খুব ইচ্ছে হয় কারো কাছে গিয়ে মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে। তার দুঃখ ঝুড়িভরা। সাধুর খোঁজ পেয়ে একদিন সন্ধেবেলা চলেও

এসেছিল সাঁটুলাল। সাধুটা নাকি ভীষণ তেজালো, শূল চিমটে কিংবা ধুনি থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে লোককে তাড়া করে। তা তেজালো সাধুই সবার পছন্দ। সাঁটুরও।

সন্ধেবেলা সাঁটু ঢিবিতে উঠে দেখল লেংটি পরা জটাধারী ভয়ংকর সাধু বসে বসে খাচ্ছে। কাছেপিঠে কেউ নেই, কেবল বেলপুকুরের মতিলাল একধারে চোরের মতো খোলা ছাতা সমুখে ধরে বসে আছে। তামাকের কারবারে মতিলাল গতবার খুব মার খেয়েছে। সেই থেকে লটারীর টিকিট কেনে, হাতে গুচ্ছের কবজ আর সাধুর খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে খুঁটি গাড়ে।

সাঁটুলালকে দেখে মতিলাল হাতের ইশারায় ডেকে বলল—এখন কথাটথা বোলো না, বাবার ভোগ হচ্ছে। আর খুব সাবধান, বাবা কিন্তু হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে। আমার ছাতার আড়ালে সরে এসো বরং।

মতিলালের ছাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে সাঁটুলাল সাধুর খাওয়া দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারে না। ভাল ঠাহর হচ্ছিল না অল্প আলোয়, তবু মনে হচ্ছিল যেন কীসের একটা বড়সড় ঠ্যাং চিবোচ্ছে!

মতিলাল ঠেলা দিয়ে বলল—দেখছ কী! নিজের চোখে যা দেখলাম প্রত্যয় হয় না।

সাঁটু মতির কাছ ঘেঁষে বলল—কী দেখলে?

মতিলাল ফিসফিস করে বলে—সবটা দেখিনি। সন্ধের মুখে মুখে এসে হাজির হয়ে দেখি বাবার সামনে একটা আধজ্যান্ত শেয়াল পড়ে আছে, মুখ দিয়ে ভকভক করে রক্ত বেরোচ্ছে, তখনো পাঁজর ওঠানামা করছিল। ধুনি জ্বেলে সেই আধজ্যান্ত পশুকে আগুনে ভরে দিল মাইরি, কালীর দিব্যি। তারপর ঐ দ্যাখো, কেমনতারা করে খাচ্ছে।

সাঁটু শুয়োরের মাংস পর্যন্ত খেয়েছে, কিন্তু শেয়াল পর্যন্ত যেতে পারেনি। শুনে আর একটু মতিলালের কাছে ঘেঁষে বসল। মতিলাল কানে কানে বলল—স্বয়ং পিশাচসিদ্ধ মহাদেব। বুঝেছ? এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কত জন্মের ভাগ্যি।

শেয়াল খেয়ে সাধু ঘাসে হাত পুঁছে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। মতিলাল খুব সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সাধুর পা দাবাতে লেগে যায়।

সাধুর শেয়াল খাওয়া দেখে সাঁটুর গা বিরোচ্ছিল। মতি হাতের ইশারায় ডাকলে সে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধানাই-পানাই বলতে শুরু করল—বাবা, আমি বড় পাপী। তা বাবা, দুঃখী লোকেরা পাপ না করেই বাঁচে কিসে বলো! তাই ভাবছি বাবা, তুমি যদি আশীর্বাদ করো তো কাল থেকে ভাল হয়ে যাব।

সাধু চিত হয়ে শুয়েছিল, কথা শুনে মুখটা ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু। ভারি ছুঁচোলো নজরটা। সাঁটুর তো ছুঁচ ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হয়েছিল।

সাধু কিন্তু গাল দিল না, একটু হেসে বলল—শালা নিমকহারাম পাঁচটা টাকা আর একটা জবাফুল নিয়ে আসিস কাল। এখন যা।

সাঁটু চারদিকে চেয়ে শেয়ালের নাড়ীভুঁড়ি, ছাল আর পোড়া মাথাটা দেখে 'ওয়াক' তুলে সেই যে চলে এসেছিল আর যায় নি। যাবেই বা কোন মুখে? জবাফুলের জোগাড় ছিল, কিন্তু পাঁচটা টাকা?

সাধু চোতসংক্রান্তির স্নানে যাবে বলে তল্পি গুটিয়েছে, কিন্তু ঢিবির ওপরকার মাটিতে দাদের মতো পোড়া দাগ রয়ে গেছে। বাতাসে একটা পচাটে গন্ধও। শেয়াল খেলে লোকে পাগল হয় বলে শুনেছে সাঁটুলাল।

অর্ধেক কাঠিটা দেশলাইয়ের খোলের বারুদে ঠুকবে কি ঠুকবে না তা খানিক ভাবে সাঁটু। এ বাতাসে ধরবে না মনে হয়।

ঢিবি বেয়ে সাঁটুলাল নেমে আসে খানিক। এবার বাতাস একটু আড়াল পড়েছে। 'জয় মা কালী' বলে সাঁটু কাঠিটা ঠুকে দিল খোলে। বিড়বিড়িয়ে উঠল আগুন। গেল : গেল : হুই রে : সাঁটু বিড়ি হাতের খাপের মধ্যে গুঁজে প্রাণপণে টানে।

জয় মা! ধরেছে। নিবেই গিয়েছিল আগুনটা, শুধু কাঠিটা লালচে হয়ে ছিল বলে ধরল।

ভারি খুশি মনে ঢিপির ওপর বসে সাঁটুলাল দূরের দিকে চেয়ে থাকে! বিড়িটা শেষ হয়ে এলে এটা থেকেই আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হাঁটা দেবে।

পাপ-তাপগুলো সবই যেমন-কে-তেমন থেকে গেল তার। কাউকে বলা হল না। মতিলালের পাপ-তাপ বোধ হয় সাধু টেনে নিয়ে গেছে। সাঁটুলাল বিড়ি টানতে টানতে ভাবল—নাঃ শালা, কাল থেকে ভাল হয়ে যাব।

বড় রাস্তা দিয়ে একটা বাস আসতে দেখে সাঁটু তাড়াতাড়ি উঠে হাঁটা ধরে।

হাত তুলতে বাসটা থেমেও গেল। কিন্তু কনডাকটর নিত্যচরণ মুখ চেনে। উঠতে যেতেই হাত দিয়ে দরজাটা আটককরে বলল—উঠছো যে পয়সা আছে তো?

—আছে আছে।

দোনো-মোনো করে নিত্যচরণ দরজা ছাড়লো বটে কিন্তু নাহক অপমান করে বলল—সিটে বোসো না, মেঝেয় বোসো।

তাতে সুবিধেই সাঁটুলালের। মেঝেয় বসলে তেমন নজর পড়বে না। পয়সা মাপও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সিটে জায়গাও নেই। সেই বসেই ট্যাক থেকে একটা বিড়ি বার করে নিত্যচরণের দিকে বাড়িয়ে দিল। যদি নেয় তো ভাল, না নিলে খুব দিক করবে।

তা নিত্যচরণ নিল। নেওয়ারই কথা। নিত্যচরণের দ্বিতীয়পক্ষ উলুবেড়ে থেকে চিঠি দিয়েছে আজ। বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে অত হাওয়ার মধ্যেও কী করে কোন কায়দায় যেন নিত্যচরণ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলল। তারপর বুকপকেট থেকে ন্যাতানো পোস্টকার্ডটা বের করে জড়ানো অক্ষরের লেখা পড়তে থাকে একমনে। তার মুখে রাগ, বিরক্তি, বৈরাগ্য আর হাসি ফুটে উঠতে থাকে। চামেলি লিখেছে—শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তারপর লিখি যে, সুপারি সব পাড়া হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দ ঠাকুরপো এবং ভাশুরঠাকুর হিসাব দেয় নাই। এত কটা মোটে দিয়েছে। তুমি বৈশাখে এসে হিসাব চেও। আমাকে দিনরাত্রি কথা শুনায়। কেন আমি কি কেউ না। সতীনপো পর্যন্ত বলে তিন্নির মা, মা ডাকে না। কথা আরো কত আছে। বলে দুই বউতে সমান ভাগ। ভাগ বড়। আমার ভাগের খড় শামলালকে বিক্রি করিয়াছি। পাঁচ টাকা এখনো বাকি আছে। তোমার টাকা

পাইনি। কী করে সংসার চলে বলো? তিন্নির আমাশা হওয়ায় কত খরচ হয়েছে সে খবর কেই বা রাখে। আমার কে আছে। হাটবারে মুকুন্দ ঠাকুরপোকে পাউডার আনিতে পয়সা দিয়াছিলাম। সে কি দোষের বলো। ঠাকুরপো আনে নাই পয়সা আমার হাতেও দেয় নাই, তিন্নির হাতে ফেরত দিয়া বলিয়াছে অত বিবি সাজতে হবে না পাঁচজনে কুকথা বলে। সতীন চরিত্রের দোষের কথা বলে বেড়ায়। মা কালীর নামে দিব্যি কেটে লিখি যে সে কথা কেউ বলিতে পারিবে না। পোস্টকার্ডে আর জায়গা নাই। প্রাণনাথ রাখো শ্রীচরণে! চরণাশ্রিতা চামেলি।

শেষ লাইনটা 'রাবণ বধ' যাত্রা থেকে নেওয়া! নিত্যচরণ শ্বাস ফেলে পোস্টকার্ডটা আবার পকেটে ঢোকায়। বিড়ি নিবে গেছে। আবার ধরিয়ে নিল নিত্যচরণ।

সাঁটুলাল নিত্যচরণের মুখের ভাব দেখছিল একমনে। মোটে মাইলখানেক রাস্তা? দেখি না দেখি না বলে কাটিয়ে দেবে। চিঠিটা আর একটু যদি লম্বা হত! লোকে যে কেন লম্বা লম্বা চিঠি লেখে না তা বোঝে না সাঁটুলাল।

নিত্যচরণ অবশ্য পয়সা আদায় করল না শেষ পর্যন্ত। নামবার সময় শুধু বলল—এই চারশো বিশ, বাস কি জল দিয়ে চালাই আমরা? তেল কিনতে পয়সা লাগে না!

বাস তেলে চলে না জলে চলে তা জেনে সাঁটুর হবেটা কী? সে নিজে যে কিসে চলে সেইটাই এক ধাঁধা। চলেও গেল এই বছর পঞ্চাশেক বয়স পর্যন্ত।

পথটা খুব পার হওয়া গেছে। চোতমাসের রোদে এ পথটুকু কমতি হল সে একটা উপরি লাভ।

সুখচন্দ্রের সঙ্গে আগে আগে কথা বলত না সাঁটুলাল। এখন বলে। ভেবে দেখেছে, সুখচন্দ্রের দোষ কী? সরস্বতীকে তো সে নিজে এসে ভাগায়নি। সরস্বতী নিজে থেকেই ভেগে গেল। বরং অন্য কারো চেয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে আছে সে বরং ভাল। লোকটা কাউকে বড় একটা দুঃখ দেয় না। ফুর্তিবাজ লোক। যা আয় করে তা খেয়ে-পরে ওড়ায়। বাজারের সেরা জিনিসটা আনবে। মরসুমের আমটা কাঁঠালটা বেশি দাম দিয়ে হলেও কিনবে, ঘরে তার রেডিও পর্যন্ত আছে। আগের পক্ষে বাঁজা বউ শেফালীকেও খারাপ রাখেনি। নিজের বাড়ি শেফালীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় সরস্বতীর জন্য আলাদা ঘর তুলেছে। দুই বাড়িতেই যাতায়াত।

অনেক ভেবেচিন্তে সাঁটুলাল দেখেছে, ব্যাপারটা খারাপ হয়নি। প্রথম প্রথম তার অভিমান হত বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে তিন-তিনটে বাচ্চা সমেত সরস্বতী তার ঘাড়ে গন্ধমাদনের মতো চেপে ছিল এতদিন। এই যে সে রাতে খাড়ুবেড়েতে যাত্রা শুনতে গিয়ে রাত ভোর করে তারপর বেলাভর ঘুমিয়ে নাড়ুগোপালের মতো হেলতে দুলতে তিন প্রহর পার করে ফিরছে, সরস্বতী থাকলে হতে পারত এমনটা? মাগী গিয়ে এখন তার ঝাড়া হাত-পা! ওদিকে ছেলেপুলেগুলো দুবেলা খেতে পায়, পরতে পায়। সরস্বতীর চেহারা আদতে কেমন তা সাঁটুলালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পাঁচ সাত বছর পর থেকে কেউ বুঝতে পারত না। এখন সরস্বতী পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন চামড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাত পায়ের গোছ হয়েছে খুব। গায়ে রস হয়েছে। চোখে ঝলক খেলে। বেশ আছে।

গোঁজ মুখ করে ঘুরে বেড়াত সাঁটুলাল, একদিন সুখচন্দ্র ডেকে বলল—সাঁটুভায়া,

ভগবান আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। তুমি আমি কি আলাদা? সরস্বতী এসে জুটল, ফেলি করে বলো?

এমনি দুচার কথা হতে হতে সাঁটুলাল ভাব করে ফেলল। তবে সরস্বতীর পুরোনো সব রাগ যায়নি। সুখচন্দ্র যতই মিতালী করুক সরস্বতী এখনো দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে তার কেচ্ছা গায়।

গাওয়ার মতো কেচ্ছা কিছু কম নেই সাঁটুলালের। তার সারাটা জীবন চুরি ছ্যাঁচড়ামি আর ছিনতাইয়ের কাণ্ডে ভরা। সে সব পুরোনো কথা। গত সপ্তাহে পালপাড়ার কদমতলায় সাঁটু নিজের মেয়ে কুন্তিকে গঙ্গা-যমুনা খেলতে দেখে মায়ায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। শত হলেও সন্তান। মেয়েটাও খানিক খেলা করে বাপের কাছে এল দৌড়ে। একগাল মিষ্টি হেসে ডাকল—বাবা! বুক জুড়িয়ে যায়! মেয়েটার খালি গা, পরনে শুধু একটা বাহারি রংচঙে ইজের।

সাঁটুর চোখটাই পাপে ভরা। যেখানে যত লোভানী আছে সেখানে তার পাপ নজর পড়বেই কি পড়বে। মেয়েটাকে দেখতে গিয়ে প্রথমেই তার নজর পড়ল মেয়ের কোমরের কাছে ইজেরের কষি এক জায়গায় একটু উল্টো ভাঁজ হয়ে আছে! আর সেই ভাঁজে স্পষ্ট একটা আধুলি আর কয়েকটা খুচরো পয়সার চেহারা মালুম হচ্ছে।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খানিক আদর করেছিল সাঁটু। তারপর মেয়ে ফের গঙ্গাযমুনার কোর্টে ফিরে গেল, সাঁটু গেল বাজারে বাবুর জন্য সিগারেট আনতে। আর যেতে যেতেই টের পেল, কখন যেন তার হাতে একটা আধুলি দুটো দশ পয়সা আর একটা পাঁচ পয়সা চলে এসেছে। মাইরি! মা কালীর দিব্যি! সে টেরও পায়নি কখন আপনা থেকে পয়সাগুলো এসে গেল। একেবারে আপনা থেকে।

এসে যখন গেলই তখন তাকে ভগবানের দেওয়া পয়সা মনে করে সাঁটুলাল তৎক্ষণাৎ নগদানগদি তাড়ি খেয়ে ফিরল। বাবুর বাড়ির ফটকে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী আর তার গা ঘেঁষে কুন্তি। আর যাবে কোথায়? প্রথম মেয়েটাই দেখতে পেয়ে চেঁচাল—মা! মা! ঐ যে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী ঠিক কলের গানের পুরোনো বয়ান ছেড়ে যেতে লাগল—বাপের ঠিক নেই, নষ্ট মাগীর পুত, কেলেকুত্তার পায়খানা। ডোমে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তোকে টেনে ভাগাড়ে ফেলবে। নিব্বংশের ট্যাটা, মেয়েকে পয়সা দিয়ে ডাল আনতে পাঠিয়েছি—আর মেয়েরও বলিহারি বাবা—কোন আক্কেলে তুই ঐ গরুচোরের ব্যাটাকে সোহাগ দেখাতে গেলি! গেল তো! ঘাটের মড়ার আক্কেল দেখ! মেয়ের ইজেরের কষি থেকে পয়সা মেরে দিল। বলি ও ঢ্যামনা, পয়সার জন্য তুই না পারিস কী বল দেখি!

বলত আরো। বাবুর বউ বেরিয়ে এসে চোখা গলায় বলল—দেখ সরস্বতী, ছোটোলোকের মতো চেঁচাবে তো দূর হয়ে যাও। সাঁটু, তুমিও এক্ষুনি বিদেয় হও। একটা চোর, আর একটার মুখ আঁস্তাকুড়। আমার বাচ্চাটা এ সব শুনে আর দেখে শিখবে। যাও, যাও।

সরস্বতী অবশ্য বাবুর বউকে ভয় পায় না। উল্টে তেজ দেখায়। কিন্তু সেদিন আর

বাড়াবাড়ি করেনি। শুধু শাসিয়ে রেখেছিল আটাচাক্কির বিশেকে দিয়ে মার খাওয়াবে। সেদিনই সন্ধের মুখে বিশে সাঁটুকে ধরে দোকানঘরের পিছনে আবডালে টেনে নিয়ে দিলও ঘা কতক। আরো দিত, সুখচন্দ্র সাড়াশব্দে এসে পড়ে বলল—যাক গে, বারো আনা তো মোটে পয়সা! কিন্তু সুখচন্দ্র মাপ করে তো সরস্বতী করে না। সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—মুখ দিয়ে রক্ত বেরোবার পর ছাড়া পাবে। সাঁটুলাল সরস্বতীর পা ধরতে উবু হয়ে বসে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

সাঁটুলাল নিজেকে আজও জিজ্ঞেস করে—পয়সাটা কি সত্যিই মেরেছিল সাঁটু। সাঁটু শিউরে উঠে বলে—মাইরি না। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। শালার পয়সাগুলোই ফক্কড়, বুঝলে! আমাকে জব্দ করতে কোন ফাঁকে সুট করে চলে এল হাতে।

এইসব দুঃখের কথা সাঁটুলাল কাউকে বলতে চায়। উজাড় করে বলবে সব। কিন্তু সাধুটা সটকেছে। আছেই বা কে?

গতকাল সাঁঝের মুখে বাবুর বউ নদীয়াল মাছ কিনতে পয়সা দিয়ে পই-পই করে বলেছিল—দেখো সাঁটু, পয়সার হিসেব দিও। সরে পোড়ো না।

সাঁটুলাল মনে মনে দিব্য কেটেছিল—আর নয়। এবার মানুষ হতে হবে। পাঁচজনের কাছে দেখানোর মতো মুখ চাই।

পয়সাটা ফেরত দিত সাঁটু যদি নিজে সে ফিরত। হল কি গ্রহের ফের। বাজারে গিয়ে দেখল নদীয়াল মাছ ওঠেনি। কয়েকটা ন্যাটা চ্যাং মাছ উঠেছে যা বাবুরা খায় না। পয়সা নিয়ে ফিরেই আসছিল। তেমনি সময়টায় হরগোবিন্দ খবর দিল খাড়ুবেড়েয় যাত্রা হচ্ছে। যাবে নাকি সাঁটুলাল? আগুপিছু ভাবনা সাঁটুলালের কোনো কালেই ছিল না। চাঁদনী রাত ছিল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। বাবুর বাড়িমুখো হতে আর ইচ্ছে হল না তার। মনে মনে ভাবল—আজকের রাতটাই শেষ পাপ-তাপ করে নিই। কাল থেকে মাইরি—কাল থেকে ভাল হয়ে যাব একেবারে। এই ভেবে তাড়ি খেয়ে নিল প্রাণভরে। তারপর খাড়ুবেড়ের রাস্তা ধরল।

আজ তাই ফিরতে একটু লজ্জা-লজ্জা করছে তার। সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়লে বাবুর বউ বড় চেঁচামেচি করবে।

সাঁটুলাল তাই বাজারের দিকে আটাচাক্কির দোকানে গিয়ে উঠে বলল—কী খবর হে সুখচন্দ্র? ভাল তো?

সুখচন্দ্র বেশ মানুষ। মুখে একটা নির্বিকার ভাব। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক সুখচন্দ্রের মুখে কোনো শুকনো ভাব নেই। বলল—ভাল আর কই? কাল থেকে তুমি নাকি হাওয়া। বাবুর বাড়িতে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে, যাও।

—যাচ্ছি। বলে সাঁটুলাল বেঞ্চিতে বসে পড়ে। বিশে চাক্কি চালাচ্ছিল। আটা উড়ছে ধুলোর মতো চারদিকে। হুড়ো দিয়ে বলল—যাও যাও। কাজের সময় বসতে হবে না।

সাঁটুলাল দাঁত খেঁচিয়ে বলে—তুমি কে হে। যার দোকান সে কিছু বলে না তোমার অত ফোপরদালালী কীসের?

লেগে যেত। কিন্তু এ সময়ে সাঁটুর ছেলে বিষ্ণু রাস্তা থেকে উঠে এসে সুখচন্দ্রকে বলল—বাবা, মা বলে দিল ফেরার সময় আনাজ নিয়ে যেতে।

সাঁটু প্রাণভরে দেখছিল। তার ছেলে। হ্যাঁ তারই ছেলে। সুখচন্দ্রকে 'বাবা' ডাকছে! আহা ডাকুক। ওর 'বাবা' ডাকার মতো লোক চাই তো। সে নিজে তো আর মানুষ নয়।

ছেলে বেরোলো তো পিছু পিছু সাঁটুলালও বেরোয়। ছেলে কয়েক কদম হেঁটেই পিছু ফিরে বলে—তুমি আসছ কেন?

সাঁটু একটু রেগে বলে—কেন, তোর বাবার রাস্তা?

—তুমি অন্য বাগে যাও। নইলে মাকে বলে দেবো।

—কী বলবি?

—তুমি কুন্তির পয়সা চুরি করেছিলে না? মনে নেই?

—ওঃ চুরি! গঙ্গাযমুনা খেলতে গিয়ে ছুঁড়ি কোথায় পয়সা হারিয়ে আমার ঘাড়ে চাপান দিলে।

—সে যাই হোক, তুমি কাছে আসবে না আমাদের।

—বাপকে কি ভুলে গেলি বিষ্টু?

ছেলে চলে গেল।

পালপাড়ার পুকুরধারে শেফালী ধরল তাকে। গা ধুয়ে ঘরে ফিরছে। দেখতে পেয়ে বলে—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

শেফালী মোটা মানুষ। শরীর ঢিলাঢালা হয়ে গেছে। ঘামাচিতে গা কাঁথার মতো হয়ে আছে। গোলপানা থোম্বা মুখখানা দেখলে কাতলা মাছের মাথার কথা মনে পড়ে। দাঁতে নস্যি দেওয়ার নেশা আছে। একগাল হেসে বলল—খবর শুনেছ নাকি? তোমার যে আবার ছেলে হবে।

ছেলে কি বাতাসে হয়! সাঁটু অবাক হয়ে বলে—আমার ছেলে হবে কি গো!

—ঐ হল। তোমার বউয়ের।

সাঁটু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল—কি যে বলো বউঠান!

—বলছি বাপু, শুনে রাখো। তবে এও বলি, সরস্বতীর পেটেরটা যদি তোমার ছেলে না হয় তবে সে তোমাদের সুখবাবুর ছেলেও নয়।

সরস্বতীর ছেলে হবে শুনে সাঁটুলাল খুশিই হল। আহা! হোক, হোক। ছেলেপুলে বড় ভালবাসে সরস্বতী। ছেলেপুলে নিয়ে সব ভুলে থাকে।

খুশি মনে সাঁটুলাল বলল—ভাল, ভাল।

ভাল কি! অ্যাঁ। ভালটা কী দেখলে? পাঁচজনে যাই বলুক, আমি তো সুখবাবুর মুরোদ জানি। ছেলের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা সে মেনীমুখোর নেই। থাকলে আমার বাঁজা বদনাম ঘুচত। তুমি বুঝি ভেবেছ সুখবাবুর ক্ষমতায় কাণ্ডটা হচ্ছে। আচ্ছা দিনকানা লোক তোমরা। এ সুখবাবুর কাজ নয় গো। সাঁট আছে।

—কীসের সাঁট?

থোম্বা মুখে ঢলাঢলি হাসি খেলিয়ে শেফালী বলে—দেখেও দেখ না নাকি! বিশে যে তোমাকে সেদিন খুব ঠেঙাল সে কেন জানো? বিশেকে যে দীনবন্ধুবাবু তার কারবারে বেশি মাইনেয় লাগাতে চেয়েছিল তাতে বিশে গেল না কেন জানো? সে যে এখানে বিশ টাকা মাইনে আর দুবেলা খোরাকি পেয়ে আঠার মতো কেন লেগে আছে

জানো? বোঝো না? বিশে আর সরস্বতীর ভাবসাব দেখেও বোঝো না? চোখ কান খোলা রেখে চলবে। তা হলে আর পাঁচজনের কাছে শুনে বুঝতে হবে না। যাও, বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবো।

ভাবাভাবির কি আছে তা সাঁটুলাল বোঝে না। দিনের মতো পরিষ্কার ব্যাপার। তবে কিনা সাঁটু এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপার হল, সরস্বতীর আবার ছেলে হচ্ছে।

বাড়ি ঢুকতেই আগে বাবুর সঙ্গে দেখা। বাগানের রাস্তায় শোয়ানো চেয়ার পেতে বসে বই পড়ছে। কেবল বই পড়ে। শোনা যায় কলেজের খুব নাম-করা মাস্টার। মেলা বিদ্যা জানে। যদিও ধান আর চিটের তফাত বুঝতে পারে না। তা সে হোক, বেশি বোঝেন না বলেই ভাল। বুঝলে বড় মুশকিল।

বাবু মুখ তুলে দেখে বললেন—সাঁটুলাল যে। কোথায় গিয়েছিলে?

—এই আজ্ঞে। কাল থেকে আর হবে না।

—সে জানি। কিন্তু বাড়ির সবাই ভাবছিল খুব।

—আর হবে না।

বাবু রোগা রোগা লোক, বেশি কথা বলে না। শুধু গম্ভীর হয়ে বলল—বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড় মুশকিল দেখছি।

ভিতর-বাড়িটা থমথম করছে। বউদি এই সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠল। মুখ-টুখ ফুলে রাবণের মা। তার ওপর এলোকেশী ঠোঁটে শুকনো রক্তের মতো পানের রস। গলায় কপালে ঘাম। আঁচল কুড়োতে কুড়োতে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, ভিতরের বারান্দায় তাকে দেখে থমকে গিয়ে বলল—তুমি কার হুকুমে বাড়িতে ঢুকেছ? বেরোও এক্ষুনি।

সাঁটুলাল টপ করে কান ধরে ফেলে বলল—কাল থেকে আর হবে না।

ঘুম থেকে উঠলে মানুষের তখন তখন আর তেমন তেজ থাকে না। বউদিরও রাজ্যের আলিস্যি। হাই তুলে বলল—পয়সাটা ফেরত দেবে তো?

—মাইনে থেকে কাটান দিয়ে দিবো বরং।

—চায়ের জল চড়াও গে যাও। বলে বউদি কুয়োর দিকে গেল!

চায়ের জল চড়ানোর কথা সাঁটুলালের নয়। সে বাইরের কাজের লোক। জল তোলে, গরুর দেখাশোনা করে, দুধ দোয়ায়, বাগান করে, কাপড় কাচে আর ফাই-ফরমাশ খাটে। ঘরের কাজ সরস্বতীর ওপর। রান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটানো বা মোছা। তাই চায়ের জল করার কথায় অবাক মানে সাঁটুলাল।

কাজ তেমন জানা নেই। তবু পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল। রান্নাঘরের দরজা জুড়ে মেঝেয় আঁচল পেতে সরস্বতী শোওয়া। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আহা, ঘুমোক। আবার মা হবে। এ সময়টায় শরীর এলিয়ে যায়। সরস্বতীর হাঁ মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বসছে। হাত নেড়ে তাড়াল সাঁটুলাল।

তারপর খুব সাবধানে সরস্বতীকে ডিঙিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। কেরোসিনের স্টোভকে জুত করতে পারছিল না। খুটুরমুটুর করে নাড়ছিল। শব্দ পেয়ে সরস্বতী পাশ

ফিরে রক্তচোখে চেয়ে বলল—ওকি! রান্নাঘরে ধুলোপায়ে ঢুকেছ যে বড়! বাইরের জামাকাপড় নিয়ে ছিষ্টি ছুঁচ্চো! তুমি কি মানুষ? সাতবাসী হেগো মোতা কাপড়। তার ওপর কোথায় কোন আঁস্তাকুড়ে রাত কাটিয়েছ! বেরোও।

সাঁটুলাল সরস্বতীর মুখপানে চেয়ে খুব হাসে। বেশ লাগছে দেখতে। মা হওয়ার চেহারাই আলাদা।

সরস্বতী উঠে বসতে বসতে বলল—চৌকাঠ পেরোলে কেমন করে বলো তো। আমাকে ডিঙোলে নাকি?

—তা কী করব!

—কী করব মানে? জলজ্যান্ত মানুষকে ডিঙোতে হয়?

সাঁটুলাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল—পোয়াতি মানুষ যেখানে সেখানে শুয়ে থাকো কেন, এ সময়টায় অসাবধান হওয়া ভাল না।

কে জানে কেন, এ কথায় সরস্বতীর মুখে বন্ধন পড়ে গেল। আর একটাও কথা না বলে উঠে চলে গেল বোধহয় কুয়োতলায়। একটু বাদে ভেজা মুখচোখ নিয়ে ফিরে এসে বলল—সরো, আমি চা করছি।

সাঁটুলাল সরল বটে, কিন্তু গেল না। দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরস্বতীর দিকে। সরস্বতী টের পাচ্ছে তবু চোখ তুলে তাকাচ্ছে না।

সরস্বতী তাকাচ্ছে না বলে যে সাঁটুকে খাতির দেখাচ্ছে তা নয়। আসলে এই পোড়ামুখখানা দেখাতে তার ইচ্ছেই করে না।

স্টোভের সলতে কমে গিয়েছিল। টিনের চোঙাগুলো খুলে সরস্বতী সলতে টেনে বড় করে দেশলাই জ্বেলে সলতে ধরাল। কেটলি চাপিয়ে কেরোসিনের হাত ধুতে গেল উঠোনবাগে। দেশলাইটা পড়ে রইল মেঝেয়।

সাঁটুলালের দেশলাই ফুরিয়েছে। সেই আধখানা কাঠি দিয়ে কখন একটা বিড়ি খেয়েছে। ভাবাভাবি বড় ঝামেলা। দেশলাইটা তুলে নিয়ে সাঁটু সরে পড়ল। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। জল তুলতে হবে, গরুর জাবনা দিতে হবে, গোয়ালে ধোঁয়া। তার আগে আবডালে কোথাও বসে ভরপেট বিড়ি খাবে এখন।

তেঁতুলের ঠান্ডা ছায়ায় বসে সাঁটুলাল পশ্চিম আকাশে রঙের বাহার দেখছিল। বিড়ি খেলে মাথাটা খুলে যায়। সব ভাল লাগে কিছুক্ষণ। তাড়ি খেলে আরো খোলে। গাঁজা খেলে তো স্বর্গরাজ্য হয়ে যায় দুনিয়াটা।

বিড়িটা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন বাবুর ছ'বছরের মেয়ে বাবলি এসে পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল—সাঁটুদা, তুমি পয়সা চুরি করে পালিয়েছিলে?

সাঁটু একগাল হেসে বলে—না। মাইরি না।

—আমি জানি। তুমি পয়সা চুরি করে কাল চলে গিয়েছিলে। কান ধরো।

সাঁটু কান ধরে জিভ কেটে বলে, ছি ছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কাল থেকে আর করব না।

রোজ নতুন নতুন সব ব্যাপার শিখছে বাবলি। আজকাল ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে কত কি শিখে আসে। যেমন এখন বাবলি একটা শুকনো গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে বলে—হাত পাতো।

সাঁটু হাত পাতে। বাবলি দুর্বল হাতে গাছের ডালটা দিয়ে সাঁটুর হাতে মারে। বলে, আর করবে?

—না গো।

—নীলডাউন হও।

সাঁটু নীলডাউন হয়।

আর কী করবে ভেবে না পেয়ে বাবলি বলে—আচ্ছা, হয়েছে। মেরেছি তো! শাস্তি দিয়েছি তো। এস, এবার আদর করি।

বলে কাছে এসে বাবলি সাঁটুর মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে চুলে হাত বুলিয়ে বলে—ষাট, ষাট, ষাট। লেগেছে সাঁটুদা?

বড় যন্ত্রণা হল সাঁটুর বুকটার মধ্যে। এক পুকুর জল উঠে আসতে চায় চোখে। মাথা নেড়ে বলে—না, না লাগেনি। আমি চোর খুকুমণি, তাই আমার ছেলেপুলেরাও আমাকেও ঘেন্না পায়। তুমি রোজ মেরো আমাকে। বুঝলে?

—এমন শাস্তি দেবো তোমাকে রোজ সাঁটুদা, দেখবে ভয় পেও না, আবার ষাট করে দেবো।

ভিতর-বাড়িতে দেশলাই নিয়ে ফের চেঁচামেচি হচ্ছে। হোক। সব দিকে কান দিলে হয় না। সাঁটুলালের অনেক কাজ। তাই উঠে গোয়ালঘরের দিকে গেল।

সন্ধের পর বাগানের রাস্তা থেকে বাবুর শোয়ানো চেয়ার আর জল বা চা রাখবার ছোট টুল তুলতে গিয়ে সাঁটুলাল সিগারেটের প্যাকেটটা পেয়ে গেল। তাতে দু'দুটো আস্ত সিগারেট। সাঁটু খুব অভিমানভরে ভাবল, নিলে লোকে বলবে চোর। কিন্তু এই যে হাতের নাগালে দুটো সিগারেট তার ভাগ্যে পড়ে আছে, এর মধ্যে কি ভগবানেরও ইচ্ছে নেই?

সাঁটু সিগারেটের প্যাকেটটা কামিনীঝোপের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। রাতে ভাত খাওয়ার পর জমবে ভাল।

রাতের কাজ সেরে সরস্বতী বিদেয় নিয়েছে। বিকেলে দেশলাই নিয়ে আজ আর বেশি চেঁচায়নি। মুখোমুখি দেখা হতে তেমন চোখে চোখে তাকায়ওনি লাল চোখ করে। বাবু আর বউদিও আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুতে গেল।

বাইরের বারান্দায় শতরঞ্জি আর একটা কাঁথা পেতে শুয়ে সিগারেট টানছিল সাঁটুলাল। ঠিক সে সময়ে অন্ধকার ফুঁড়ে সরস্বতী উঠে এসে বলল—আমি পোয়াতি—একথা কে বলল তোমায়?

সাঁটু শুয়ে শুয়েই ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে—আমার সঙ্গে থাকতে তিনবার হয়েছিলে, লক্ষণ সব চিনি কিনা। বলবে আবার কে?

সরস্বতী উবু হয়ে বসে বলে—মিছে বোলো না। শেফালী কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছে। তার কাছেই শুনেছ। আচ্ছা পাজি মেয়েছেলে যা হোক। নিজের হবে না, অন্যের হলে শতেক দোষ খুঁজবে। এসব কথা জানাজানি হলে সুখকর্তা আর রাখবে ভেবেছ?

সাঁটুলাল মাথা চুলকোয়।

সরস্বতী আস্তে করে বলল—শোনো, তুমি সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে বলবে যে, তোমার

সঙ্গে যখন থাকতুম তখনো আমার চরিত্রের দোষ ছিল না, এখনো নেই। বুঝলে? তোমার মুখের কথার দাম হবে। নইলে সুখচন্দ্র আজ রাতে ঐ মাগীর কাছে থাকতে গেছে, রাতভর এমন বিষ ঢালবে কানে যে, পুরুষটা বিগড়োবে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রের সঙ্গে বসে নানা কথার মধ্যে এক ফাঁকে কথাটা তুলো।

উদাসভাবে সাঁটুলাল বলে—তুলব'খন।

—তুলো। তুমি লোক খারাপ নয় আমি জানি। দুটো টাকা রাখো। বলে আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ-করা টাকা বের করতে যায় সরস্বতী।

ভারি লজ্জা পায় সাঁটুলাল। বলে—আরে থাক, থাক। ওসব রাখো।

—নাও, বিড়িটিড়ি খেও। মাসে দশ টাকা মাইনে পাও, তাতে কী হয়। রাখো এটা। আমি সদর ভেজিয়ে রেখে চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—হ্যাঁ, যাও। চারিদিকে ভারি চোর-ছ্যাঁচোড়।

—সে জানি। বলে সরস্বতী আঁধারে মিলিয়ে যায়।

সাঁটুলাল দু-নম্বর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলে। সরস্বতী বলে গেল, সে নাকি ভাল লোক। সত্যিই কি আর বলেছে! মন রাখা কথা। কিন্তু যদি সত্যিই তাকে ভাল লোক বলে জানত সবাই।

হাতের সিগারেটটার দিকে চেয়ে রইল সাঁটুলাল। ভারি রাগ হল নিজের ওপর। আচমকা সিগারেরটা প্রায় আস্ত অবস্থায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের দু'গালে ঠাসঠাস করে কয়েকটা চড় দেয়।

রাগ তাতে কমে না। নিজের ঘাড় ধরে নিজেকে তোলে সে। তারপর নিজেকে নিয়ে ফটকের বার করে দিয়ে বলে—যা হারামজাদা আহাম্মক ছ্যাঁচড় চোট্টা কোথাকার! ফের যদি আসিস তো জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো। এই বলে হাত ঝেড়ে সাঁটুলাল ফিরে আসে। কালই গিয়ে সুখচন্দ্রকে বুঝিয়ে আসবে যে, সরস্বতী বড় সতী মেয়ে। তার গর্ভে সুখচন্দ্রেরই ছেলে। আর টাকা দুটোও ফেরত দেবে সরস্বতীকে। সে ঘুষ-টুষ খাবে না আর। পুরোনো সাঁটুলাল বিদেয় নিয়েছে।

খুব আনন্দে খানিক ডগমগ হয়ে বসে রইল সাঁটুলাল। মনটা ভারি বড়সড় হয়ে গেছে। বুকে যেন হাওয়া-বাতাস খেলছে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

কামিনীঝোপের নিচে পড়ে থাকা সিগারেটটা ধোঁয়াচ্ছে। এখনো অনেকটা রয়েছে। খামোকা পয়সা নষ্ট।

সাঁটুলাল গিয়ে সিগারেটটা তুলে আনল ফের। বসে বসে মনের সুখে টানতে লাগল। দেশলাইটা নেড়ে দেখল অনেক কাঠি রয়েছে। বাঁ ট্যাকে সরস্বতীর দেওয়া টাকাটা।

সাঁটুলাল ভাবল—এই শেষ পাপ-তাপ বাবা। কাল থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছি।

হরীতকী

আজ এই পূর্ণিমা রাতে টিউশনি সেরে ফেরার পথে গিরিজা টের পেলেন, তাঁকে কানাওলায় ধরেছে।

বাঘাযতীন পার্কের পাশ দিয়ে গুটিগুটি হেঁটে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে দিব্যি আসছিলেন। শরৎকালের ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, শীত-শীত লাগছিল। কোনো বাড়ির বাগান থেকে শিউলি ফুলের গন্ধও ভেসে আসে, সেই সঙ্গে একটা ডাল ফোড়নের গন্ধওলা জায়গাও পার হয়ে এলেন। খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। আবুর মা ওবেলা একটা ফুল মার্ক পাওয়া মোচাঘণ্টা রেঁধে রেখেছে, এবেলাও সেটা দেবে, সেই সঙ্গে ঘানির তেল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ডালসেদ্ধ—ভেবে একটু তাড়াহুড়ো করে হাঁটছেন। বাঘাযতীন পার্ক পেরিয়ে দু-নম্বর ডাবগ্রামের রাস্তা পেরিয়ে আদিগন্ত জ্যোৎস্নায় এক নম্বর ডাবগ্রামের রাস্তায় নেমে পড়তেই টের পেলেন, রাস্তা চিনতে পারছেন না। জ্যোৎস্নারাতে মফঃস্বলের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো থাকে না। তা না থাকুক, ফটফটে রাস্তাঘাট সবই দেখা যাচ্ছে। আমগাছ, জামগাছ চেনা যাচ্ছে। কিন্তু কানাওলা ধরলে আর কিছু উপায় থাকে না। দশবার নিজের বাড়ির সদর দিয়ে হেঁটে গেলেও বাড়ি চেনা যায় না।

ছেলেবেলা থেকেই এই কানাওলা ভূতটা প্রায়ই ধরে এসে গিরিজাকে। একা জুতমতো গেলেই সাপটে ধরে, খুব নাকাল করে ছেড়ে দেয়। তার ওপর গিরিজার বয়স এই তিয়াত্তর পেরোলো, এ বয়সে অনেক কিছুই ভোঁতা মেরে যায়। মাথার মধ্যে সব সময়ে একটা ধন্ধ ভাব।

ডাবগ্রামের এক মাথায় সরকারি গুদাম। পিপে যদি আড়াআড়ি করে আধখানা মাটিতে পোঁতা যায় তবে যেমন দেখতে হয় গুদামের চেহারা অবিকল সেরকম। লম্বা লম্বা ঘর, টিনের ছাউনি গোল হয়ে নেমে এসেছে। সারি সারি চল্লিশ-পঞ্চাশটা গুদামঘরের ভিতরে রাস্তাটা ধাঁধা মেরে গেল। কাছেপিঠে লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। রাত্রি বাজে দশটা। চারদিক ঝিম মেরে গেছে। গিরিজা এদিক-সেদিক ঘুরলেন। খুব খিদে পেয়েছে। রাস্তা পাচ্ছেন না। গত পনেরো বছর এইসব রাস্তায় যাতায়াত। তবু পাচ্ছেন না। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন, কানাওলা এক কানাভূত যাকে ধরে তাকে চেনা রাস্তায় ঘুরপাক খাওয়ায় তার আবডালে বসে হি হি করে হাসে। ভূতেদের যা স্বভাব! যৌবনকালে গিরিজা যখন বিজ্ঞান পড়তেন তখন বয়োধর্মে আর ভূত-ভগবান মানতেন না। এই বুড়ো বয়সে আবার সেই শিশুবেলার ভয়ভীতি ফিরে এসেছে। এখন ভূতও আছে, ভগবানও আছে। গিরিজাপতি তাই কানাওলাকে তাড়ানোর জন্য ডাকেন—রাম রাম! জয় সচ্চিদানন্দ রঘুপতি রামচন্দ্র। রাম হে, হরি হে—

কোথায় কী? রাস্তা-ঘাট সব গুলিয়ে গেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না প্রায় রোদ্দুরের মতো উজ্জ্বল। রাস্তায় নুড়ি-পাথরটার পর্যন্ত ছায়া পড়েছে। গুদাম ঘরগুলোর টিনের ছাউনিতে

খট খটাং করে শব্দ হয় মাঝে মাঝে। সে ভূতের ঢিল নয়। তিনি জানেন, সারাদিনে তেতে থাকা টিন রাতের ঠান্ডায় একটু একটু করে সংকুচিত হয়ে আসে, তাই এ শব্দ। জেনেও কিন্তু মন মানে না, চমকে উঠে ভাবেন—ভূতের ঢিল নয়তো বাবা, অ্যাঁ!

যে বাড়িতে টিউশনি করেন সে বাড়ির কর্তা ভবেশ রায় নিজেকে বুড়ো মানুষ ভাবেন। বয়স কিছু না, মোটে বাষট্টি। বিরাট অবস্থা। গোটা দুই চা বাগানের মেজর শেয়ার, গোটা ছয়েক লরি, বিধান মার্কেটে ফ্যান্সি দোকান। সুখী মানুষ। প্রায়ই এসে মেয়ের পড়ার ঘরে বসে গিরিজার সঙ্গে আড্ডা দেন। কিন্তু গিরিজার সঙ্গে ভবেশের মতের মিল হয় না। ভবেশ বলেন—বুড়ো বয়সে খাওয়া কমানো উচিত। তাই ভবেশ রায় নিজেও কম খান। একটা মধুপর্কের বাটির মাপের এক বাটি ভাত একবেলা, সকাল বিকেল এক চিমটি করে ছানা, রাতে গোনা দুখানা রুটি। এই খেয়েই নাকি খুব শক্ত আছেন ভবেশ গিরিজার সেটা ভাবতেই কষ্ট হয়। অত কম খেয়ে বাঁচে নাকি লোকে? তাঁর নিজের তো অনন্ত খিদে। এক গোছা রুটি আর জলের গেলাস দিয়ে বসিয়ে দিলে এই বসে নির্দন্ত মুখে টাউ টাউ করে শুধু মাড়িতে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন পলকের মধ্যে।

তবে কি গরিবেরই খিদে পায় বেশি?

আজ রাতে ভাত হবে। শালবাড়ির দিকে বিঘে চারেক জমি আছে, বর্গায় চাষ করে। সেখান থেকে পরশুদিনই আধমন চাল দিয়ে গেছে ভালমানুষ বর্গাদার। কদিন রাতের খাওয়াটা বেশ হচ্ছে। ফোটা ভাতের গন্ধ পাচ্ছেন যেন গিরিজা! কিন্তু কোথায় ভাত! কেবল অকাজের জ্যোৎস্না চারদিকে।

২

আবুর কাজ বলতে দুটো, কালী-সাধনা আর বকবক।

কালী-সাধনা অবশ্য তার নিজের খেয়ালখুশি মতোই করে। ঘরের এক জায়গায় দেয়াল নোনায় খেয়েছে। সেই দাগধরা জায়গাটার দিকে চেয়ে সারাদিন একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে সে রামপ্রসাদী থেকে যাবতীয় শ্যামাসঙ্গীত সম্পূর্ণ বেসুরে গায়। সাধনার যে দিকটায় কালী নামটা আর পুরো উচ্চারণও করতে পারে না, কেবল বলে—কাঃ কা কা, কাঃ কা কা—। সে স্নান করে না, স্নানের বদলে সে রোজ সকাল-বিকেল আধ কলসী করে জল খায়। সেটা নাকি অন্তস্নান। দেহের সব ময়লা ঐ জলের ঠেলায় ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তখন গামছা দিয়ে গা মুছলেই স্নান হয়ে গেল। মাথার চুল জটা হয়ে পিছন দিকে মৌচাকের মতো ঝুলে থাকে। ওদিকে কপালের ওপর দিকটায় টাক পড়ে যাচ্ছে। উকুনের চুলকানিতেও নখের ডগায় চুল উঠে আসে। তা টাকই পড়ুক, আর জটাই ঝুলুক, আবুকে সুন্দর দেখবার কেউ নেই। বউ তার সঙ্গে থাকে না। বিয়ের পর বারো বছর কষ্টেসৃষ্টে ছিল, তারপর বাপের বাড়ি চলে গেছে। কোথায় একটা চাকরি-বাকরি করে। মাস পয়লা আবার আবুর কাছ থেকেও কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। আবু পেশকারী করে। সাধুসন্ত মানুষ বলে তার রোজগার বেশি নয়।

ইদানীং তাকে হরীতকীতে পেয়েছে। কেরাসিনওলা রামু বাড়ি বাড়ি ঘুরে

সাইকেলওলা গাড়িতে কেরোসিন বেচে। রামু বলে তার বয়স নাকি নব্বই। ইয়া স্বাস্থ্য, যুবকদের চেয়েও বেশি শক্তি।

আবুর আবার সকলের সঙ্গেই ভাব। সারাদিন বকবক করতে হলে লোক বাছাবাছি চলে না। প্রতিদিনই সে কিছু না কিছু অপরিচিত লোককে আপন করে ফেলে। রামুর সঙ্গে তার ভাব অবশ্য দীর্ঘকালের। দিন সাতেক আগে রামু তাকে কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস খেতে দিয়েছিল, কচি কচি হরীতকী, বালিতে ভাজা। ভারি ভাল খেতে। ভাজা হরীতকী খেয়ে আবু মোহিত হয়ে গেল। রামু বলে—হারা খেয়ে এই নব্বই বরিষ উমরে আমার এত তাকৎ।

কোনো জ্ঞানই ফ্যালনা নয়। সেই থেকে আবু-হরীতকীর পিছনে লেগেছে। গত সাতদিন মানুষ হরীতকীর জীবন-যৌবন-দায়েনী ক্ষমতার কথা শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেল। তবু আবুর ক্লান্তি নেই। বিধান মার্কেট আর পুরোনো বাজার ঘুরে সে ইতিমধ্যে প্রায় তিন কিলো হরীতকী এনে ফেলেছে। জামার দু'পকেট ভর্তি হরীতকী নিয়ে ঘোরে, যাকে তাকে ধরে ধরে খাওয়ায়। নিজে সবসময় মুখে হরীতকী নিয়ে ঘুরছে।

সন্ধেবেলা সে মানিকরামের ডাক্তারখানায় উঠে বসে পড়ল। ডাক্তারখানায় রুগী-টুগী আসে না। মানিকরামের ঢের পৈতৃক পয়সা আছে, আর ব্রিজ খেলার নেশা। পসার নেই। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ তাকে ডাকে না, বলে—ও তো তাস খেলতে খেলতে ডাক্তারি ভুলে গেছে। তবু ডাক্তারখানা আছে নামকোবাস্তে। সন্ধের পর সেখানে ব্রিজের আড্ডা বসে, কিছু উটকো লোক সময় কাটাতে আসে, গল্পগাছা হয়। আবু ডাক্তারখানায় ঢুকতেই কিছু লোক খবরের কাগজের পাতা ভাগ করে ডুব দিল, একজন অন্য ধারে উঠে গেল। চোরের দায়ে ধরা পড়ল বেকার কম্পাউন্ডার সাধন। সে টোকা দিয়ে মশা মেরে টেবিলের ওপর জড়ো করছিল। রোজ সেঞ্চুরি করে। আজও তিরাশিটা হয়েছে এ পর্যন্ত। আর সতেরোটা বাকি। টেবিলের ওপর মরা মশার একটা ছোটো স্তূপ তৈরি হয়েছে। চুরাশি নম্বর মশাটা পন্‌পন্‌ করে কানের কাছ থেকে উড়ে এসে থুতনিতে ধাক্কা খেয়ে বসি বসি করছে। সাধন খুব সাবধানে অনড় হয়ে লক্ষ রাখছিল। এমন সময়ে আবু উঠে এসে ঝপ করে বসেই বলতে শুরু করল—হত্তুকির যা কাণ্ড দেখলাম গত সাত দিনে, বলার নয়।

মশাটা বসল না। উড়ে অন্য ধারে চলে গেল। বিরক্ত হয়ে সাধন বলে—বেশি খেও না আবুদা।

আবু অবাক হয়ে বলে—বেশি খাব না?

—না। পরে বিপদে পড়বে।

আবু রেগে গিয়ে বলে—হত্তুকির তুই জানিসটা কি শুনি! মুনি-ঋষিরা একটা করে পাকা হত্তুকি খেয়ে কতকাল বাঁচত জানিস?

—মুনি-ঋষির কথা বাদ দাও। তারা না হয় একটা করে খেত, তুমি কিন্তু দশ-বারোটা করে চালাচ্ছ। শেষে বিপদে পড়ে যাবে।

—যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলবি না। বিরক্ত হয়ে আবু বলে।

—দাসীর কথা বাসী হলে কাজে লাগবে। সাধন চুরাশি নম্বর মশাটিকে গোড়ালির

হাড়ের ওপর খতম করে টেবিলের ওপর রাখল। আর ষোলোটা। আবুর দিকে চেয়ে বলল—বেশি হত্তুকি খেলে শুক্রতারল্য হয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে ওঠে আবু। মূর্খে বলে কী? তাছাড়া হরীতকীতে ওরকম কিছু হতে পারে, এ ভাবাই যায় না।

আবু বলে—বুঝলে বাবা, হরীতকী হল অমৃত। এ রেগুলার খেলে একশো দুশো বছর বেঁচে থাকাটা কোনো কথাই নয়। বাঁচতে বাঁচতে ঘেন্না ধরে যাবে। তখন মরার জন্য আনচান করে উঠবে, কিন্তু মরা কি সহজ?

ডাক্তারখানা থেকে নেমে রাস্তায় সে মুদী খগেনকে পেয়ে গেল। খগেন তার রাখা মেয়েমানুষের বাড়ি যাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে সঙ্গে পেয়ে ভারি আহ্লাদ আবুর। হরীতকীর যাবতীয় গুণের কথা কি বলে শেষ করা যায়! এত সস্তা, হাতের কাছের জিনিস লোকে তবু গ্রাহ্য করে না। মূর্খ সাধনচন্দ্র কী যে সব বললে! হ্যাঃ! এক হপ্তা খেয়ে আবুর নিজের পুরোনো অম্বলের অসুখ নেই। অম্বরের চাকা পেটময় বেড়াত, গলে তরল হয়ে গেছে। চোখে ছানির ভাব ছিল, কেটে গেছে। বাহান্ন বছর বয়সে এখন হঠাৎ শক্তির জোয়ার এসেছে গতরে।

হঠাৎ আবু খগেনকে বলল—দাঁড়াও।

খগেন দাঁড়ায়। রাস্তার পাশে প্রচুর বড় বড় চাঁই পাথর পড়ে আছে, রাস্তা মেরামতের কাজে লাগবে। তারই একটা মাঝারি চাঁই তুলে নিয়ে আবু রাস্তার পাশে মাঠটায় যতদূর সম্ভব ছুড়ে দিলে, বলল— দেখলে? গত সাতদিনে কতটা ক্ষমতা বেড়েছে!

খগেন শ্বাস ফেলে বলে—দেখেছি।

তার দেরি হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের ভিতর দিয়ে শর্টকাট করতে নেমে গেল খগেন। একা একা কালীর গান করতে করতে আবু সরকারি গুদামের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

৩

এই বয়সে খিদেটা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো। হুড়মুড় করে উঠে পড়ে কাঁপুনি তুলে দেয়! এ বয়সে সব বেগই বড় তড়িঘড়ি আসে। সামলানো যায় না। মূলমূত্র ত্যাগে একটু দেরি করেছো কি সব কাপড়-চোপড়ে হয়ে যাবে। খিদেও তাই। উঠল বাই তো কটক যাই।

গিরিজার চক্ষে জল আসে। পেটটা ডেকে ডেকে কত কথা বলছে ভিখিরির মতো। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কোলকুঁজো হয়ে কোনোক্রমে সেটাকে সামালও দেওয়া যাচ্ছে না। রাস্তাঘাট সব জ্যোৎস্নায় ডুবিয়ে মায়াবী রং করে রেখেছে। তিনটে রাস্তায় তিনবার যাওয়ার চেষ্টা করে গিরিজা একই জায়গায় ঘুরে এলেন। কানাওলায় ধরলে এরকমই হওয়ার কথা। চেনা রাস্তায় দশবার ঘুরলেও দিক্‌ভ্রম হবে, নিজের বাসার সদর দিয়ে গেলেও চেনা যাবে না। বয়স তিয়াত্তর, এই বয়সেই ভূতেরা এসে ধরে।

—জয় রাম, জয় রাম। জয় রঘুপতি। গিরিজা বিড়বিড় করতে থাকেন।

ঠঙাৎ করে একটা শব্দ হয়। টিনের চালে কে একটা মস্ত ঢিল মারল। এ টিনের শব্দ বলে ভুল হওয়ার নয়। বাস্তবিক ঢিল। টিনের চাল থেকে ছিটকে সামনের রাস্তায় পড়ে ব্যাংবাজির খাপড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঘাসজঙ্গলে পড়ল। স্পষ্ট

দেখা। চোখে এখনো ভালই দেখেন গিরিজা। ঢিলটা পড়তেই তারস্বরে রাম নাম করতে করতে একটা গুদামঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েন। বেহায়া ভূত। বুড়ো মানুষকে নিয়ে এ কি কাণ্ড বাবা! সব জায়গাতেই বুড়ো-ধুড়ো দেখলে সকলের রসের ভাঁড়ে তুফান জাগে। রাস্তাঘাটে চ্যাংড়ারা কত পেছুতে লাগে, বাজারের দোকানীরা 'দাদু দাদু' বলে রঙ্গ করে, তো ভূতও বাকি থাকে কেন?

এখন হিম পড়ে বলে ছাতাটা নিয়ে বেরোন। রাতের বেলা টিউশনি সেরে ছাতা মাথায় ফিরে আসেন তো লেকে পেছুতে লাগে, বৃষ্টি-বাদলা বা রোদ না হলে ওরা ছাতার মর্ম বুঝবে কী। বুড়ো হোক, আগে সব ব্যাটা বুড়ো হোক, তখন বুঝবে। ছাতাটা ফেলে এসেছেন ছাত্রীর বাড়িতে।

আর একটা ঢিল গদাম করে পড়ল কাছে-পিঠেই, কোনো গুদামের চালে। ঢিল নয়, এখন আধলা কিংবা থান ইট ছুড়ছে। একটা-দুটো চৌকিদার এখানে ঘোরাফেরা করে রোজ। তাদেরও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্না রাতে বোধহয় আহ্লাদ হয়েছে খুব ব্যাটাদের; ছিলিমে দম দিয়ে, নয়তো সিদ্ধি চড়িয়ে কি দিশর চাপান দিয়ে পড়ে আছে। সরকারি গোয়ালে আর কি ধোঁয়া দেবে!

আছেন শুধু রামচন্দ্র। হৃদিস্থিতেন। কিন্তু তবু বুকটা বড় কাঁপছে। খিদেটা পেটের মধ্যে খেঁকী কুকুরে মতো ঘেউ ঘেউ করে ধমকাচ্ছে তাঁকে।

ছাতাটা হাতে থাকলে একটু সাহস পেতেন। ভূতপ্রেত যাই হোক, ছাতা লাঠি কিছু হাতে থাকলে যেন একটু জোর বল পাওয়া যায়। ওরা অবশ্য ছাতা কাল ফেরত দেবে। তবু—

তাঁর ছেলে আবুটা মানুষ নয়। বউ বিপদ বুঝে ছেলেপুলে নিয়ে পিটটান দিয়েছে। সারাদিন মাথামুণ্ডু করে বেড়ায়। যৌবন বয়সে মিলিটারিতে গিয়েছিল মণিপুর ফ্রন্টে। সেখান থেকে ফিরে ওকে কালীতে পেল। ঘুমের মধ্যে 'বুবি ট্রাপ বুবি ট্রাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠত। তারপর নানা ঘাটের জল খেয়ে এখন পেশকার। ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছেন পেশকারী সোনার চাকরি। পেশকারের মা বেনারসী পরে পায়খানায় যায়, তেল দিয়ে আঁচায়, কোথায় কী? আবু মাস মাইনের অর্ধেক তার খাণ্ডার বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে আসে। সেই বউ মাইনের তারিখে কোর্টের দরজায় মোতায়েন থাকে। উপরিও পায় না কিংবা নেয় না। অপদার্থ ভ্যাগাবন্ড।

ভাববেন, তার জো কী! ভূতটার আজ রস উছলে পড়ছে। দমদম ঢিল মারছে ইদিক-সিদিক। ছাতাটা থাকলে কতকটা রক্ষে হত। তখন কোন্‌টা মাথায় এসে পড়ে। রাম রাম। যৌবন বয়সে ভূতকে মানেননি বলে আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দুটো কান ধরে বললেন—ঘাট হয়েছে বাবা! আর অমন করব না। তোমাদের গড় করি। ভাল করে নিজের কান মললেন, কাঁদলেনও একটু। বলেন—রাস্তাটা চিনিয়ে দাও বাবাসকল, জ্যোৎস্না একটু ঘুরিয়ে ফেল, চোখ ধাঁধিয়ে যায় বাবা। খিদের টানে শরীর হজম হয়ে যাচ্ছে। ঐ বুঝি চৌকিদারের হুঁশ এল এতক্ষণে।

—কোন্ হ্যায় রে? বলে অশ্রাব্য খিস্তি দিল একটা। তারপর লাঠি ঠুকবার আওয়াজ। কে যেন চেঁচিয়ে বলল—উও ভাগ রহা। এ রামরিখ ভাই, পাকড়ো—

খুব চেল্লাচেল্লি আর দৌড়াদৌড়ি লেগে গেল। আশপাশেই হচ্ছে। গুদাম-ঘরগুলোর

জন্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। ভারী ভারী জুতোর শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। ধুপধাপ মাটি চমকাচ্ছে।

একটু নিশ্চিত হন গিরিজা। লোকজন দেখলে ভূত তফাত যায়।

কিন্তু রাস্তা বেভুল-করা কানাওলা যে এখনো ছাড়েনি। কোন্ দিকটায় যাবেন ঠিক ঠাহর পাচ্ছেন না। তবু গুটিগুটি রওনা দিলেন। দেখা যাক।

বাপ রে! কালো মতন কি একটা ধেয়ে এল। জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা করাল চেহারা। আকাশের দিকে হাত তোলা, চুল উড়ছে, আর হা হা অট্টাহাসি।

কেঁদে কঁকিয়ে উঠে বসে পড়েন গিরিজা, অস্ফুট গলায় বলতে থাকেন—রাম রাম রাম রাম—

ভূতটা থমকে দাঁড়ায়। বলে—কে রে রাম নাম করিস?

গিরিজা সভয়ে বলেন—বুড়ো মানুষ বাবা, মাপ করে দাও।

—কালীর নাম কর, কালীর নাম কর। কালীর নামে জগৎ উদ্ধার.....আরে বাবা নাকি?

গিরিজা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান। ছাতাটা ফেলে এসেছেন বলে খুব দুঃখ হচ্ছে। হাতে থাকলে দামড়াটাকে ঘা কতক দিতেন।

ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বললেন—তুই কোত্থেকে—অ্যাঁ?

আবু ঝুপ করে বাপের হাতটা চেপে ধরে বলে—দৌড়োও। চৌকিদাররা টের পেয়ে গেছে।

—কী টের পেয়েছে!

—পরে বলছি। দৌড়তে না পারো জোরকদমে হাঁটো। নাহক এসে হামলা করবে।

—কিছু করেছিস নাকি?

বাপের হাত ধরে গুদামঘরের ছায়ায় ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে জোর হাঁটে আবু। বাবাকে প্রায় হিঁচড়ে নিয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে—আ৷ না। কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ছিলাম!

গিরিজা অবাক হয়ে বলেন—ঢিল ছুঁড়েছিলি? আজ কি নষ্টচন্দ্র?

—আরে না। বলে খুব হাসে আবু।

—তবে কি শেয়াল?

—আরে না। শালারা হত্তুকির গুণ মানতে চায় না। গত সাতদিন ধরে খেয়ে আমি বুঝতে পেরেছি হত্তুকির মতো জিনিস হয় না। যৌবন ফিরে আসে। দেখবে? গুদাম পার হয়ে মাঠের মধ্যেকার পথ পেয়ে গেছে তারা। আবু একটা মস্ত ঢেলা কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আচমকা চাঁদের দিকে ছুঁড়ল। সেটা খানিক উঠেই ধপ করে পড়ল।

—দেখলে? আবু জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

—হ্যা-হ্যা। খুব ক্ষমতা বেড়ে যায়। চৌকিদার শালারা ধরতে পারত নাকি আমাকে? এমন দৌড় দিয়েছিলাম না? কি যে দম পাই এখন বাবা, মনে হয় এক নাগাড়ে দশ-বিশ ক্রোশ দৌড়োতে পারি। হত্তুকিতে সব হয়।

গিরিজা নিশ্চিন্তে হাঁটছেন। পাগল হোক, ছাগল হোক, তবু তো ছেলে। ঠিক সময়টায় গিয়ে ঐ ভূতুড়ে গোলকধাঁধা থেকে হাত ধরে টেনে এনেছে। ভগবান এখনো আছেন। রাম নামের জোর কিরে বাবা! কবার করতে না করতেই বাতাস ফুঁড়ে ছেলে বেরিয়ে এসে কুড়িয়ে নিল। নইলে বেঘোরে মারা পড়তেন নির্ঘাত।

আবু বলে—বুঝলে বাবা।

—হুঁ।

—যুদ্ধের সময়ে মণিপুর ফ্রন্টে আমাদের একরকম বড়ি দিত। খেলে খিদে নষ্ট হয়ে যেত, শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠত। চারদিকে বুবি ট্রাপ, বুবি মানে জানো তো। বুবি মানে বোমা। মাটিতে মাইন, ওপরে বোমা। সে সময়ে একটু ঝিমুনি এল কি খিদেয় অস্থির হলে তো গেলে। ঐ বড়ি খেলে সব কেটে যেত। মাইলের পর মাইল জঙ্গল ভেঙে বোঝা টেনে হাঁটতাম। বুঝলে বাবা, বহুকাল বাদে হত্তুকিতে আবার সেরকম জোর পাচ্ছি। দেখবে? একটু দৌড়ে দেখাব?

—না না থাক। গিরিজা ভয় খেয়ে বলেন। কানাওলাটা আশপাশেই ঘুর ঘুর করছে। ছেলে তফাত হলেই ধরবে। তিনি অস্ফুট গলায় বলেন—রাম রাম।

আবু বিরক্ত হয়ে বলে—কালী কালী বলো। কালীর নাম আর হত্তুকি। দেড়শো-দুশো বছর হেসে-খেলে—

বাড়ি এখনো দূর আছে। খিদেটা এমন কামড়ে বেড়াচ্ছে পেটের মধ্যে। মোচার ঘণ্ট আর ডালসেদ্ধ দিয়ে পেট ভরে ভাত খাবেন আজ গিরিজা। ব্যাটারা বলে বুড়ো বয়েসে কম খেতে হয়। ইঃ। কম খাবে!

আবু হাত বাড়িয়ে একটা হত্তুকি দিয়ে বলে—খাও বাবা। সাংঘাতিক জিনিস।

খিদেটা বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। হত্তুকিটা আস্ত মুখে ফেলে মাড়ি দিয়ে চিবোতে থাকেন গিরিজা। সাঁৎ সাঁৎ করে হত্তুকিটা পিছলে যাচ্ছে মাড়ি থেকে। রস বেরোচ্ছে না তবু চেষ্টা করতে থাকেন গিরিজা। চেষ্টাই তো জীবন।

ঘরের পথ

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে।

কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেওয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভাল খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থই থই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম। আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিলেন বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেননি। আমি বাবার ঘোড়াকে ভালবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়ত।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠ পাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরিব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধেবেলা, কখনো কখনো রাত্রি হত। যাওয়ার সময়ে মা বলত, সারাদিন ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেক। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝব তুমি ভাল আছ, ঘরে আছ। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারাদিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁদিকে মস্ত মাঠের ওপাশে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত। পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ঐ পাহাড় পেরিয়ে আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ঐ পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে কটা নদী কটা পাহাড় পার হতে হয় মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ায় চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ঐ পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না। অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিবল। দূরের নীল পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হল। মা আর ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে শুধু আমার মা বাদে। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।'

আমার বিশ্বাস হল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, 'তার জন্য ভাবনা কি, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচলে চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?'

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতিপাতি করে খুঁজলাম। ওরা বলল, 'খুঁজে কী করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।'

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, 'তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয় কাঠ কুড়োবি।'

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মার দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মাও আর ফিরল না। রইল শুধু ঘোড়াটা। সেই ঘোড়াও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনো মাঠে চরতে যায়, বেশির ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙাচোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, 'ঘোড়াতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস!'

ঘোড়াটি নিয়ে ছিলাম মেতে। বাদবাকি সময়টা কাটতো চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারাদিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনেপাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকত মাটিতে; কযেকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা'টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠল গজিয়ে।

দিন কাটে, সন্ধে হলে পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মার শরীরের তাপের মতো মনে হয়। তাই কখনো ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ী কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, 'এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দু'জনে বেশ থাকবি।'

'উঁহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কী?'

'শাকপাতা যখন যা হয়।'

বুড়ী গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মতো খাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, 'কী দেখছিস? কী দেখিস রোজ?'

ও বল, 'তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?

'ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালোবাসি।'

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, 'ভালবাসার আর লোক পেলি না। ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?'

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস। আমি বললাম, 'জানি না রে।'

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, 'ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেওয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেওয়াল আর বেশিদিন থাকবে না। ধসে পড়বে। সময় থাকতে শত্তুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'ওরা আমার মায়ের মতো। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শিকড় থাকে।'

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, 'তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।'

আমি ভাবলাম, শেকলগুলো গর্ত খুঁড়বে, আরও গভীর হবে। মনের দেয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায়

বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূর থেকে পাকা ধানের ক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসব একদিন রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফাগনলালের ঘরের পাশ দিয়ে মৌরিক্ষেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সেদিকে চেয়ে সারা দুপুর কাটল। চন্দ্রা এল না। তার পরদিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে-পেতে আমার পুরোনো মরচে ধরা দা'টা বের করে পাথনে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুর পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল। ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা'য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশি লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, 'এতদিন আসিসনি কেন?'

ও গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাব। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।'

আমি বললাম, 'জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ী রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।'

'হ্যাঁ শুনেছিস। তাতে কী? এমন বুঝি হয় না?'

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব। খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।'

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, 'তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?'

আমি বলাম, 'জানি না।'

ও বলল, 'মা দেখছিল, তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কিনা। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমন গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, 'কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।'

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা ডালগুলো খ'সে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হল, ছলাৎছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মতো একটা ভাব বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালমন্দ নেই। এ শুধু

আমাকে মাতাল করে। আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হল। আমার ইচ্ছে হল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল। শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশিওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। ক্ষেতের মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশিওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনো এই বাঁশিওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, 'আমি বাঁশি বিক্রি করি না। বাঁশির সুর বিক্রি করি।' এই বলে সে তার বাঁশিতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, 'বাঁশিতে তুমি ওটা কি সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।'

বাঁশিওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মতো চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখল, বলল, 'এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা শুনি তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনো নোঙর করা নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনো শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।'

সে আবার তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। শেষে শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশীর টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মতো টলতে লাগল। যেন অনেক দূর পথ। আমাদের এই মৌরিক্ষেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া এই দেশ। বাঁশির সুর সেই দূর-দূরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মতো নরম, বিষণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে, অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে—আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ! আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটা বুড়ো হল। বাবা আর ফিরল না।

বাঁশিওয়ালা সুর পাল্টে নতুন সুর ধরল। কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এর মানে কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বাঁশিওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। অঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শীষ বার করল আকাশে।

বাঁশিওয়ালা থামল। বলল, 'এর অর্থ যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে

আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।'

এই বলে বাঁশিওয়ালা আবার তাঁর বাঁশিতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ করো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য কর। ক্ষেতে আগুন লাগলে ফসল ভাল হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'এ সুর তুমি কোথায় পেলে?'

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, 'আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াব।'

বাঁশিওয়ালা ফিরে বলল, 'তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়। আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে কুড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে জোব্বা বানিয়েছি! যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রং নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।'

বাঁশিওয়ালা চলতে লাগল, আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না। শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা আর তার সুর দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম, এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশিওয়ালা? আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এক পাগল বাঁশিওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে— সে সুরে আমি সারাদিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশিওয়ালা আমাকে দিল সারাদিন বাজাবার এই বাঁশি? আমি যে একে ছাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু নিচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই উতরাই ভেঙে বাঁশিওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পুব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়া রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। ক্ষেতে আগুন দিলে ফসল ভাল হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। আমি জানি বাঁশিওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না। দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে

ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মা'র মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ঢাকা দিঘির মতো সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, 'তুই যে আড়েদীঘের মতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি। কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।'

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, 'তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, চোখ দুটো পেয়েছিস মা'র। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্ম লেগে যা। বসে থাকিস না। দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।'

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশিওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, 'জানি রে জানি, তোর কাছে এক বাঁশিওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।' গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল 'তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।'

চন্দ্রা এসে বলল, 'তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশির সুর কিনেছিস?'

আমি বলি, 'হুঁ।'

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বলল : 'পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস, আর বাঁশি কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কী, তোর নিজের বলতে থাকল কী? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভাল না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।'

এই বলে ও হাসল। বলল, 'আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারাদিন হাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

'গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।'

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তি রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিক্ষেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খুব পাতলা বুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশির সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না। গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমায় পিঠ চাপড়ে গেল : এই তো চাই। বাঁশির সুর কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা।

আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কী? দেখছিস না বুড়োগুলোর দশা, দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবী বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব। এই শুনে আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল। ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, 'বুড়ো তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।'

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিশ্বাস ছাড়ল। ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ কোরো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ো হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিও না! মনে রেখ, দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

'বুড়ো, তুই আমার বাপ।' আমি বললাম, 'কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।'

ঘোড়াটা পুরোনো ঠান্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু'হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, 'সারা দিন ঘরে বসে কী বকিস্ একা একা?'

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে। দু'চোখে মিটমিটে আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম বোধহয় কোনো ফুলের গন্ধ। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রং? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, 'চল, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।'

'কী জিনিস?'

ও ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।'

'কোথায় সেটা?'

ও হাসল, 'আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।''

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ওর বলল, 'এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারাদিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?'

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, 'আমার সারাদিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়! তোর বাঁশিওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?'

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন

তার গন্ধ জানি না। আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক'টা বাঘকে মারব আমি? গাঁও বুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল বাঁশির সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, 'আমি তোকে কতক বুঝি কতক বুঝি না!'

ওর বুক, ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মতো আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, 'একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।'

বাঁশিওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল, ঘর বলতে তোর কোনো কিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জ্বেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না। আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, 'তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।'

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরো বুড়ো হয়েছে। খুটখুট করে সারাদিন ঘাস খায়, কখনো ঝিমোয়!

বাতাসে গরম হলকা ছুটল, বুড়োরা বলল, 'এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।'

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে গেল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধেবেলা ও নিজেই খুটখুট করে ঘরে ফিরতে লাগল। কিন্তু একদিন ও ফিরল না। সারা সন্ধে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে কিন্তু পেটের নিচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে ঠুক্‌ঠুক করে ও ফিরল না। অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম : যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। চলতে চলতে আমি ধানক্ষেত ছাড়িয়ে, মরা মটরশাকের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম। তারপর দিগন্ত জোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মতো টলমল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার

ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'বুড়ো আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।'

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ! আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপর আমি ভয় পেলাম! আমার মনে হল কেউ যেন আছে! কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনো আত্মা আমার পিছু নিয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরল, তারপর আমাকে চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম। বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধরে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি। জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, 'বুড়ো বুড়ো।'

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, 'বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।'

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ও চিৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না। আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মতো ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, 'বুড়ো আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চিৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, 'বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।'

ও চিৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, 'বুড়ো, আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দেব।'

বুড়ো শুনল না। ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।'

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নিচু

হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিন্‌বিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলায় রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।'

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার পা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখ ঘোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বুড়ো এই ফাঁসটা নিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।'

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে। কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, শোনো তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজি হল। লোকটা কিছু রুটি কিনে আনল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কী করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশি হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো বলল, তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কি কান্না। সবাইকে ডেকে ডেকে বলল, 'দেখ, দেখ, চোট্টার কাণ্ড দেখ, আমাকে এক পোড়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।'

সবাই বলল, 'তারপর?'

গাঁওবুড়ো হাসল, 'যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।'

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁওবুড়ো মরে গেল। গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, 'জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।'

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, 'এবার ঘর ছাড়তে হবে।'

কেউ বলল, 'ঘর আর কোথায়! ঐ তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না।'

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুট্ খুট্ করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে

তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল। বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপরে প্রাণপণে বলতে লাগল, 'কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল! তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারদিকের দেয়াল নেই।'

কেউ বলল, 'অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোন ভিন-গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হল। যারা ছিল পথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।'

কেউ বলল, 'যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে, বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘে হয়ে ভাসব।' এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, 'বাইরে একটি আগুন জ্বেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছ, তুমি ভাল আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেও না।'

দাইমা বলেছিল : আমার কাছে চল। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মতো পালবো।

বাঁশিওয়ালা বলেছিল : বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ কোরো না। একটা ঋতু আসে আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল : ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশিওয়ালা মাত্র একবার আসে।

গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল : বাঁশির সুর কিনিস না। তা হলে তোর ঘরে কিছুই থাকবে না।

আমি বলেছিলাম : বুড়ো, তুই আমার বাপ। ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জ্বেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম। তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে! আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে।